মাসিক
আল-আবরার

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

The Monthly AL-ABRAR
রেজি: নং- ১৪৫ বর্ষ-১, সংখ্যা-৯

অক্টোবর ২০১২ইং, যিলক্বাদ ১৪৩৩হি: ذو القعده ١٤٣٣ه، اكتوبر ٢٠١٢م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মাওঃ নাসির উদ্দীন

প্রচ্ছদ : **মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, জাবালে রহমত, মিনা, জামরাত এবং মুযদালাফার চিত্র।**

বিনিময়: ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা - ১০,০০০(দশ হাজার)

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে ৫
পবিত্র সুন্নাহ থেকে ৭
দরসে ফিক্বহ ৮
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদূয়ী (রহ.) এর অমূল্য বাণী ১১
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মালফূযাতে ফক্বীহুল মিল্লাত ১২
মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-৩ ..... ১৪
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব
উমরা ও হজ্ব কিভাবে পালন করবেন ১৮
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান
শেয়ার বাজার-১..... ২৩
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
কোয়ান্টাম মেথড-৬..... ২৭
মুফতী শরীফুল আজম
পর্দা : গুরুত্ব ও সীমারেখা ৩৩
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
হযরত আলী (রা.) ৩৭
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৯
উদীয়মান কাফেলা ৪৩
মতের জোয়ার ৪৫
খবরাখবর ৪৮

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল: monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েভ :http://monthlyalabrar.wordpress.com/

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক:০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮১২৩৫৭৫২২
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯ সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৮৩১৭৪০৫৪০

সম্পাদকীয়

মহানবী (সা.) এর অবমাননা– বিশ্ব মানবতার উপর চরম আঘাত

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। আল্লাহ লিখে দিয়েছেন- আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, মহা পরাক্রম শালী।"

মানবতার মুক্তির দূত, রাহমাতুল্লিল আলামিন, সকল নবী-রাসূলের সর্দার, আখেরী নবী ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.) কে ব্যাঙ্গ করে চরম বিকৃত ও বিদ্বেষপূর্ণ সিনেমা 'ইনোসেন্স অব মুসলিম' তৈরীর মত সর্বাধিক ঘৃণ্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ করেছে জনৈক মার্কিন ইহুদী। গত ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ছবিটির কিছু অংশ আরবী ও ইংরেজী ভাষায় ইন্টারনেটে পোস্ট করার পর সারা মুসলিম জাহানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গোটা বিশ্ব মাবতা। সারা দুনিয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে প্রতিবাদ বিক্ষোভে। বিশ্ব ব্যাপী লাখো কোটি মুসলিম জনতার এহেন অগ্নিমুর্ত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ক্ষেত্রে কতিপয় অপ্রিতিকর ঘটনাও ঘটে গেছে বলে খবরে প্রকাশ।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু মুসলমানদের নবী নন। তিনি সারা দুনিয়ার আগত অনাগত সকল মানব ও জিন জাতির নবী। তিনি সারা দুনিয়ার কিয়ামত তক আগন্তুক মানবকুলের আদর্শ। তাঁর আদর্শ ব্যতিরেকে কোনো মানুষের মুক্তির কোনোই পথ ও পন্থা নেই। মানবতার শান্তি ও মুক্তির জন্য তাঁর আদর্শ একক এবং অনন্য। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শের বিশ্বাস হলো–

آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير (البقرة ٢٨٥)

"রাসূল বিশ্বাস রাখেন ওই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গাম্বরগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত কিতাব ও সমস্ত নবী রাসূলের উপর ঈমান আনা। দুনিয়াতে এমন কোনো ধর্ম বা মতাদর্শের নজীর নেই যেখানে এরূপ উদারতা বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা যত নবী রাসূল পাঠিয়েছেন সবই হক্ব। তা ইহুদীদের নবী হোক বা খ্রীস্টানদের। মূসা (আ.) হোক বা ঈসা (আ.)। সকল নবী আল্লাহর প্রেরিত, সকল নবী-রাসূল দুনিয়ার সকল মানবের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী ছিলেন, সকল নবী রাসূল আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন, সকল নবী-রাসূল নিষ্পাপ, তাঁদের আদর্শ ও চরিত্রে কোনো প্রকার কুটিলতার লেশমাত্র ছিল না এর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন মুসলমানদের ঈমানের অংশ। এহেন সুবিস্তৃত ঈমান ও আক্বীদা বিশ্বাস থেকে অনুমান করা যায় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ ও তাঁর প্রদত্ত আক্বীদা বিশ্বাস কতটা প্রশস্ত, উদার এবং সার্বজনীন। ইসলামের শুধু এতদ অংশের সমপরিমাণ উদার ও প্রশস্ত আকীদা বিশ্বাস বর্তমান দুনিয়ার কোনো মতবাদ, চিন্তাধারা ও ধর্ম দেখাতে পারবে না। আবার একথাও সত্য যে, পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলগণও বলে গেছেন যে, সর্বশেষ একজন নবী আসবেন, যিনি হবেন সকল নবী রাসূলের সরদার, তিনিই হলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাঁর হাতেই মানবতার সঠিক আদর্শের পরিপূর্ণতা ঘটবে।

ইসলামের এরূপ আক্বীদা বিশ্বাসে লালিত দুনিয়ার কোটি কোটি মুমিন শুধু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেন, আল্লাহর প্রেরিত কোনো নবী -রাসূল সম্পর্কে কোনো প্রকার অবমাননা ও অপমান সূচক শব্দও সহ্য করতে পারেনা। সে কারণে কোনো মহল যদি খ্রীস্টানদের নবী হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে কোনো অপমান সূচক কথা বলে, কোনো মহল থেকে যদি ইহুদীদের নবী হযরত মূসা (আ.)

সম্পর্কে কোনো অপমান সূচক কথা বলা হয়, তার সর্ব প্রথম প্রতিবাদকারী মুসলমানরাই হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুসলিম বিশ্বে স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেই কোনো কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলকে নিষ্পাপ মানেনি, বা কোনো কোনো ব্যক্তির লেখায় একথাও ওঠে এসেছে যে, নবী-রাসূলদের কেউ কেউ কোনো দোষে জড়িত হয়েছেন (নাউজু বিল্লাহ), কারো কারো কথায় স্পষ্ট হয়েছে ওই নবী এরূপ ভুল করেছেন (নাউজু বিল্লাহ) এমন কথা ও আক্বীদা বিশ্বাসও মুসলিম উম্মাহ সহ্য করেনি। বরং সেরূপ ব্যক্তিবর্গ ও সম্প্রদায়কে মুসলিম উম্মাহ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ঈমান আক্বীদার এমন এক স্পর্শকাতর স্তরে যদি স্বয়ং রহমতুল্লিল আলামীন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অবমাননা করে চলচ্চিত্র নির্মানের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়, তবে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের অন্তর ঘাত প্রতিঘাতে কি ভয়াল রূপ ধারণ করতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবমাননা বিশ্ব মানবতার অবমাননা, কারণ তিনি পুরো মানবকুলের নবী। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে অবমাননার শামিল, কারণ তিনি আল্লাহর মাহবূব, পুরো দুনিয়ার নিপূণ আদর্শ হিসেবে তাঁরই নির্বাচিত ও প্রেরিত রাসূল। সকল নবী রাসূলের অবমাননার শামিল, কারণ তিনি সকল নবী-রাসূলের সরদার। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অবমাননা, কারণ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ হলো মহনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত বাস্তব আদর্শের লৈখিক রূপ। পুরো জাহানের অবমাননা, কারণ তিনি পুরো জাহানের জন্য অনুস্মরণীয় আদর্শের মুর্তপ্রতিক। এই অবমাননা দুনিয়াতে আযাব-গজব, বিপদাপদ ডেকে আনবে নির্ঘাত, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুজাহানের রহমতস্বরূপ প্রেরিত। মোট কথা, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি বিশ্ব মানবতার ভালোবাসা অব্যাহত থাকলে বিশ্বময় আল্লাহ তা'আলার কুদরতী নেযাম-ব্যবস্থাপনা স্থিতিশীল থাকবে, তার মাধ্যমে দুনিয়া ব্যাপী শান্তি ও সুখের বাতাস বইতে থাকবে, আর নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বেআদবী হলে আল্লাহর কুদরাতী নেযামেও ব্যতিক্রম দেখা দিবে। যার রোষাণল থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। কারণ দুনিয়াবী আযাব গজব সকলকেই পরিবেষ্টন করে।

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (احزاب ٢١)

"নিশ্চয়ই রাসূলের পবিত্র জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين (انبياء ١٠٥، ١٠٧)

"আমি আপনাকে উভয় জাহানের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

ورفعنالك ذكرك (الانشراح ٣)

"আমি আপনার নাম বুলন্দ করে দিয়েছি।"

انك لعلى خلق عظيم (القلم ٤)

"নিশ্চয়ই আপনার চরিত্র মাধুরি সর্বোত্তম।"

হাদীস শরীফে আছে :

بعثت لاتمم مكارم الاخلاق (بخارى فى الادب المفرد٢٧٣)

"আমি উত্তম চরিত্রের সৌন্দর্য পূর্ণ করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"

মুমিনের সাথে মহানবীর (সা.) সম্পর্ক– পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

النبى اولى بالمومنين من انفسهم وازواجه امهاتهم (احزاب ٦)

"নবী মুমিনদের সাথে নিজেদের স্বত্তার থেকে বেশি প্রগাঢ় সম্পর্ক রাখে এবং তাঁর (নবীজীর) সহধর্মীনীগণ তাদের (মুমিনগণের) মা।"

হাদীস শরীফে এসেছে–

لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده (بخارى فى كتاب الايمان)

"তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের সন্তান সন্ততি ও মাতা-পিতার চেয়ে আমি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হব।"

যারা মহানবী (সা.) এর সাথে বৈরীতা রাখে ও তাঁর অবমাননা করে তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاٰخرة واعد لهم عذابا مهينا☆ والذين يؤذون المومنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا (احزاب ٥٨)

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"

وما كان لكم ان توذوا رسول الله ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما (احزاب ٥٣)

" আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তা আল্লাহর

কাছে গুরুতর অপরাধ।"

الـم يـعـلـموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزى العظيم (توبه ٦٣)

"তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে যে মুকাবিলা করে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সবসময় থাকবে। এটিই হল মহাঅপমান।"

ان الـذيـن يـحـادون الله ورسوله اولئك فى الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلى (مجادله ٢٠، ٢١)

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। আল্লাহ লিখে দিয়েছেন- আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।"

প্রকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বানী, পবিত্র কুরআনের এরূপ বহু আয়াতসমূহ থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবমাননা, মিথ্যা অপবাদ আরোপের জঘণ্য ধৃষ্টতা দেখানো পুরো দুনিয়ার জন্য মহাবিপদেরই অশনি সংকেত। ইসলাম পূর্ব যুগে নবী রাসূলদের (আ.) সাথে এরূপ বেআদবী, অবমাননা করার ফলে পুরো জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হতো এমন নজীর বহু আছে। কিন্তু স্বয়ং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক উম্মতের জন্য কৃত দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার এরূপ লোকদের জন্য দুনিয়াতে শাস্তির বিধান করে সামগ্রিক ধ্বংস থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে কারণে আমরা বলব সারা দুনিয়ার সকল মানুষকে বিপদমুক্ত করার স্বার্থে এধরনের কুলাঙ্গারদের বিচার করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ছাড় না দেওয়া। সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম। এই দিকটি বিবেচনা করলেও কোনো ইহুদী-খ্রীস্টান রাষ্ট্র বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এধরনের কুরুচিশীল লোকদেরকে কোনো প্রকার ছাড় দিতে পারে না।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবমাননার শাস্তি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী অত্যন্ত কঠোর। যে দন্ড বিধির উপর ইসলামের প্রারম্ভ থেকে এ পর্যন্ত সকলে একমত। ইহুদী খ্রীস্টান ধর্মেও নবী রাসূলদের অবমাননার দণ্ডবিধি হিসেবে মৃত্যু দণ্ড, জাবজ্জীবন কারা দণ্ড ইত্যাদি বিধানের প্রয়োগ ছিল। বর্তমানে এই আইনে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন এলেও এখনও বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা এবং সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেওয়ার অপরাধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে এরূপ ঘৃণ্য ধৃষ্টতা প্রদর্শনের মাধ্যমে যেমন বিশ্বের পুরো মানবতাকে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে তেমনি সারা দুনিয়ার স্থিতিশীল পরিবেশকে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে উস্কে দেওয়া হয়েছে।

আমরা এধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তীব্র নিন্দা জানাই এবং এর কঠোর শাস্তির দাবী করি। আমরা মনে করি বার বার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার এই প্রবণতা ও ধৃষ্টতা রোধে বিশ্বব্যাপী কঠোর এবং স্থায়ী শাস্তির বিধান হওয়া আবশ্যক।

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দা.বা.) এর সহধর্মিনীর ইন্তিকালে আমরা শোকাহত

মরকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা ও মহাপরিচালক, মাসিক আল-আবরারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) এর আহলিয়া মুহতারামার ইন্তিকালে আমরা শোকাহত, বেদনাক্লিষ্ট এবং মর্মাহত। হযরতের এহেন বার্ধক্য এবং অসুস্থাবস্থায় নিজের সহধর্মীনী হারানোর এই আকস্মিক ঘটনা নিশ্চয় তাঁর জীবনের দুঃসহ বেদনাবিদূর ঘটনা। আমরা মাসিক আল-আবরারের সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ! জনাবা মারহূমাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মক্বাম দান করুন এবং মরহূমার পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের সবরের তাওফীক দান করুন আমীন। আমাদের অনুরোধ মাসিক আল-আবরারের পাঠক, এজেন্ট, গ্রাহকসহ সংশ্লিষ্ট সকলে মরহূমার রূহের মাগফেরাত ও ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে একবার সূরা ফাতেহা ও তিন বার সূরা ইখলাস পাঠ করে দু'আ করবেন।

উল্লেখ্য তিনি গত ৪ঠা জিলক্বদ ১৪৩৩হিজরী মোতাবেক ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ শুক্রবার ভোর ৪টায় তাহাজ্জুদের সময় ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। একই দিন সকাল ১১টায় তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাযে ইমামত করেন তাঁর বড় ছেলে মাওলানা মুফতী আরশাদ রহমানী সাহেব।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا☆

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ পাকের রসূলের পূতঃপবিত্র জীবনে রয়েছে এক উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ পাকের মোলাকাতের এবং কেয়ামতের দিনে ছওয়াবের আশা করে এবং আল্লাহ পাককে স্মরণ করে অধিক পরিমাণে। (সূরা আহযাব ২১)

'উসওয়াতুন' শব্দটির অর্থ হলো নমুনা, দৃষ্টান্ত, আদর্শ। সমগ্র কুরআনে হাকীমে এ শব্দটি মাত্র তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূত পবিত্র জীবনে রয়েছে এক মহান অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শ। যা তোমাদের জন্য একান্ত অনুসরণীয়। যেমন, যুদ্ধে যত কঠিন বিপদেরই সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং অটুট ভরসা রেখে দুশমনের মোকাবেলায় অটল অবিচল রয়েছেন। এটি শুধু মাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট। এটিই তাঁর মহান আদর্শ। বীরত্ব, সৎসাহস, সত্য, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সহনশীলতা এসব তাঁরই আদর্শ। তাই এআয়াতে আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে। তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণেই নিহিত রয়েছে চির সাফল্য লাভের রহস্য। এ জীবনের সাফল্য লাভের এবং পর জীবনে কামিয়াবী অর্জন করার একমাত্র পথই হলো প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিপূর্ণ অনুসরণ। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের বিপদগ্রস্থ হওয়ার একমাত্র কারণ হলো প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ থেকে দূরে সরে যাওয়া।

প্রিয় নবী (সা.) সমগ্র জাতির জন্য একমাত্র আদর্শ :

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূত পবিত্র জীবনে মানব জাতির জন্য উত্তম নমুনা রয়েছে। কিন্তু কথা এখানে শেষ নয়। বরং একথাও সর্বকালের জন্য সত্য যে, প্রিয় নবীই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র আদর্শ। তাঁর আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত জীবন সাধনার সাফল্যের আর কোনো বিকল্প পন্থা নেই। সূরায়ে মুমতাহিনায় উসওয়ায়ে হাসানা শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে। আর আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে, আর যেহেতু প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াত সর্বকালের জন্য, কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবীর আগমন হবে না, তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে সমস্ত নবী রসূলগণের নবুওয়াত ও রেসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁর নবুওয়াতই সুপ্রতিষ্ঠিত। আজানের মাধ্যমে প্রতিদিন তার নবুওয়াত ও রেসালাতের ঘোষণা হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত এই ঘোষণা অব্যাহত থাকবে। যেদিন এ ঘোষণা থাকবে না সে দিন এ পৃথিবীর অস্তিত্বও থাকবে না। এ কারণেই যেভাবে তাঁর নবুওয়াত ও রেসালাত সর্বকালের মানুষের জন্য, ঠিক তেমনিভাবে সমস্ত মানুষের জন্য তিনিই একমাত্র আদর্শ। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে আল্লাহ পাক একথাই ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, একই ব্যক্তি সর্বশ্রেণীর সকল পেশার মানুষের জন্য একমাত্র আদর্শ কি করে হবেন? একজন সার্থক বিচারক আরেকজন বিচারকের জন্য আদর্শ হতে পারেন। একজন ব্যবসায়ী আরেকজন ব্যবসায়ীর জন্য স্বাভাবিকভাবেই আদর্শ হতে পারেন।একজন রাষ্ট্রনায়ক আরেকজন রাষ্ট্রনায়কের জন্য আদর্শ হতে পারেন। কিন্তু অন্য একজন ব্যবসায়ীর জন্য তিনি আদর্শ হতে পারেন না। অথচ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য একমাত্র আদর্শ, আর এটিই তাঁর বৈশিষ্ট। এ জন্য প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু যে নবী ও রসূল শুধু তাই নয়, তিনি নবী ও রাসূলগণের দলপতি, তিনি হলেন সায়্যিদুল মুরসালীন। এর পাশাপাশি তিনি প্রথম জীবনে ব্যবসাও করেছেন। তিনি মদীনায়ে মুনাওয়ারার প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। তার বিচারালয়ে পেশকৃত দুহাজার মোকাদ্দামার বিবরণও সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক। তিনিই একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, সুদীর্ঘ দশটি বছর তিনি এ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র নায়কদের জন্য তিনি আদর্শ হয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনিই ছিলেন সেনাপতি। সাতাশটি যুদ্ধ তিনি পরিচালনা করেছেন। এমনিভাবে

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য তিনি আদর্শ রেখে গেছেন। যার অনুসরণ ব্যতীত মানব জীবনে সাফল্যের অন্য কোনো পথ নেই।

لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر

অবশ্য এ আদর্শের অনুসরণ সে সব লোকই করতে পারে, যাঁদের অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। যারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর দরবারে হাজিরা দেওয়ার এবং আখেরাতের নেয়ামত লাভ করার ও আকাংখা করে। যাদের মধ্যে এই গুণ নেই তারা প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ গ্রহণ করে না, করতে পারে না।

তাফসীরকার মুকাতেল (রহ.) এ আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে "যে আল্লাহকে ভয় করে এবং কেয়ামতকেও ভয় করে, যখন মানুষকে তার সারা জীবনের কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে।" মুকাতেল (রহ.) এর মতে, আলোচ্য আয়াতের يرجوا শব্দটি ভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وذكر الله كثيرا

আর যারা আল্লাহ পাককে স্মরণ করে অধিক পরিমাণে, তারাই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসারী হয়। সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় যারা আল্লাহ পাককে স্মরণ করে, আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করে, আল্লাহ পাকের আনুগত্যের আকাঙ্খা করে, তারাই প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ করতে পারে। (তাফসীরে মাজহারী ৯/৩২৭-৩২৮)

প্রিয় নবী (সা.) এর অনুসরণ একান্ত কর্তব্য :

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– এই আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ একান্ত কর্তব্য। সত্য সাধনায়, সংকল্পের দৃঢ়তায় দুশমনের মোকাবেলায়, বীরত্ব ও সাহসিকতায়, ধৈর্য ও সহনশীলতায় এক কথায় জীবনের সকল অবস্থায় প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিপূর্ণ অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য। (তাফসীরে মাজেদী ৮৪৪)

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতিটি কথা, কাজ ও অনুমোদন সবই একান্ত অনুসরণীয়-অনুকরণীয়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ধৈর্য ও সহনশীলতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং সংকল্পের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। সম্মিলিত হানাদার বাহিনী যখন প্রাণের মদীনা আক্রমণ করে তখন মদীনাবাসী স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত অস্থির ও আতংকগ্রস্ত হয়েছিলেন। একদিকে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, অন্য দিকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মুমিনদের বলা হচ্ছে, তোমরা কেন আমার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসরণ করনা, কিভাবে তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় দুশমনের মুকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। তার বিরুদ্ধে কৃত চক্রান্তগুলো কিভাবে নস্যাত হচ্ছে, তাও তোমরা দেখ। তিনি আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারও কাছে আশা করেন না। আল্লাহ পাক ব্যতীত কাউকে তিনি ভয়ও করেন না। সারা আরব যখন তার বিরুদ্ধে হাজির হয়েছে তাতেও তিনি তার আদর্শে অনড় রয়েছেন। তার সংকল্পের দৃঢ়তায় এতটুকু ভাটা পড়েনি, তিনি ছিলেন সত্যের মুর্ত প্রতিক। অতএব তিনি প্রতিটি সত্য সন্ধানী কল্যাণকামী মানুষের জন্য একমাত্র আদর্শ। আর তাঁদের বৈশিষ্ট হল তাঁরা প্রকৃত মুমিন, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার আকাংখা ও আখেরাতে সওয়াব লাভের আশা এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ করা হল কল্যাণকামী মানুষের বৈশিষ্ট। আল্লাহ এমন লোকদেরকেই তার পেয়ারা হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণের তাওফীক দান করেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর উর্দূ পারা ২১, পৃষ্ঠা ৮৮)

বস্তুত চরম বিপদের মুহূর্তে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিভাবে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রেখে দুশমনের মোকাবেলায় অবিচল ছিলেন তা শুধু চিরস্মরণীয়ই নয় বরং চির অনুকরণীয়।

দ্বিতীয়ত:

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণেই জীবনের সাধনা স্বার্থক-সুন্দর হয়, তার আদর্শের সামান্যতম বরখেলাফ করেও কেউ সাফল্যের আশা করতে পারে না। এ জন্যই মরমী কবী বলেছেন –

خلاف پیمبر کسے رہ گزید☆ کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

অর্থাৎ হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশিত পথ ব্যতীত অন্য কোনো পথে চললে কেউই মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে পারে না। এটি আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ। (সূত্র: মা'আরিফুল কুরআন, নুরুল কুরআন, ইবনে কাসীর, বাহরে মুহিত, তাফসীরে মাজহারী)

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবমাননার শাস্তি

حدثنا ابن عباسؓ ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبى ﷺ وتقع فيه فينهاها فلا تنتهى ويزجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع فى النبى ﷺ--- (ابو داود ٦٠٠)

হযরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত, এক অন্ধ ব্যক্তির উম্মে ওয়ালাদ বাঁদী ছিল। সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে গালী দিতে থাকত এবং বিভিন্নভাবে বেআদবী করত। তিনি (অন্ধ ব্যক্তি) তাকে বারণ করতেন। কিন্তু সে (বাঁদী) পরিহার করত না। তিনি (অন্ধ ব্যক্তি) তাকে উচ্চবাচ্যও করত। কিন্তু সে (বাঁদী) কোনো কিছুই মানত না। বর্ণনাকারী বলেন, সেরূপ একদিন উক্ত বাঁদী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শানে গোস্তাখী করতে আরম্ভ করল, গালী দিতে লাগল, তখন উক্ত অন্ধ ব্যক্তি হাতে তলওয়ার নিলেন, বাঁদীর পেটে রাখলেন, চাপ দিলেন এবং তাকে মেরে ফেললেন।... নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই অন্ধ ব্যক্তির খুনের কোনো বদলা নেই।

عن على رضى الله عنه ان يهودية كانت تشتم النبى ﷺ وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله ﷺ دمها (ابو داؤد ٦٠٠)

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, এক ইহুদী মহিলা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে গালি দিত, (একদা) জনৈক ব্যক্তি উক্ত ইহুদী মহিলার গলা টিপে ধরল, এমনকি সে মৃত্যু বরণ করল। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে সাজামুক্ত করে দিলেন।

قال عمرو سمعت جابر بن عبد اللهؓ يقول قال رسول الله ﷺ من لكعب بن الاشرف فانه قد آذى الله و رسوله فقام محمد بن المسلمة الخ رواه البخارى فقتلوه وفى فتح البارى قوله آذى الله ورسوله فى رواية محمد بن محمود عن جابر عند الحاكم فقد آذانا بشعره وقوى المشركين--- ومن طريق ابى الاسود عن عروة انه كان يهجو النبى ﷺ يحرض قريشا عليهم (فتح البارى ٢٧/٧)

হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, আমি হযরত যাবের (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কা'আব ইবনে আশরাফের জন্য তোমরা কে প্রস্তুত হবে? কারণ সে আল্লাহ এবং রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা দাঁড়ালেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এরপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অবহিত করা হলো তাকে হত্যা করা হয়েছে। ফাতহুল বারীতে আছে, বুখারী শরীফের বাক্য "সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে" এর সাথে হাকেম এর বর্ণনায় অতিরিক্ত একথাও আছে যে, সে নিজের শেয়ের বা কবিতার মাধ্যমে আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং মুশরিকদের সাহায্য করেছে। অন্য সূত্রে আছে হযরত উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, কা'আব ইবনুল আশরাফ নবী (সা.) এর অবমাননা করতো এবং কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দিতো।

قال ابن كثير فى البداية والنهاية ناقلا عن البخارى قال بعث رسول الله ﷺ الى ابى رافع اليهودى رجالا من الانصار وامر عليهم عبد الله بن عتيق وكان ابو رافع يؤذى رسول الله ويعين عليه (البداية والنهاية ١٣٨/٣، فتح البارى ٤٧٤/٧)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) নিজ রচিত গ্রন্থ আলবেদায়া ওয়ান নেহায়াতে লেখেন, বুখারী শরীফে আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু রাফেকে হত্যা করার জন্য কয়েকজন আনসারী সাহাবীকে মনোনীত করলেন। যে দলের আমীর ছিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক। আবু রাফে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কষ্ট দিতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে লোকদেরকে সাহায্য করতো।

فى الصحيح للبخارى عن ابن مالك رضى الله عنه ان النبى ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزع جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله (فتح البارى ١٢/٨، البدايه والنهاية ٢٩٤/٣)

قال ابن تيمية فى الصارم المسلول وانه كان يقول الشعر يهجوبه رسول الله ﷺ ويامر جاريته ان تغنى به فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم، قتل النفس، والردة والهجاء (الصارم ١٣٥)

হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন, তখন তাঁর মাথা মোবারকে মিগফার ছিল। মাথা থেকে মিগফার খোলার পর এক সাহাবী এসে বললেন ইবনে খতল কা'বার পর্দায় লটকানো আছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাকে হত্যা করে ফেল।

সারেমুল মাসলূলে উল্লেখ আছে যে, ইবনে খতল বিভিন্ন কবিতা বলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে হেয়প্রতিপন্ন করত এবং নিজের বাঁদীকে কবিতা ও গাণ গাওয়ার জন্য বলত।

এরূপ অনেক হাদীস পাওয়া যায় যেগুলোতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অবমাননার কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তা থেকে বুঝা যায় সারা দুনিয়ার শান্তির খাতিরে এরূপ অপরাধীদেরকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া আবশ্যক।

দরসে ফিক্বহ

কুরবানী : ফজীলত ও আহকাম

মুফতী শাহেদ রহমানী

জিল হজ্বের প্রথম দশ দিনের ফজীলত:

عن ابن عباسؓ عنهما قال قال رسول الله ﷺ مامن ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشرة ---(بخارى)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইবাদতের জন্য আশারায়ে জিলহজ্জা থেকে উত্তম আর কোনো সময় নেই। ... (বুখারী)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইবাদতের জন্য আশারায়ে জিলহজ্জা থেকে উত্তম আর কোনো সময় নেই। এ সময় এক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং এক রাতের ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমান ফজীলতপূর্ণ। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

পবিত্র কুরআন মজীদে সূরায়ে 'ওয়াল ফাজরি'তে আল্লাহ তা'আলা যে দশ রাতের কসম করেছেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সে দশরাত হলো জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ রাত। বিশেষ করে জিলহজ্বের ৯ তারিখ রোযা রাখা অতীতের এক বছর এবং ভবিষ্যতের এক বছর গোনাহের কাফফারা হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং ঈদের রাতে বিনিদ্রযাপন বড় ফজীলত ও ছওয়াবপূর্ণ।

জিলহজ্বের প্রথম দশদিন চুল ও নখ না কাটা মুস্তাহাব।

তাকবীরে তাশরীকের বিধান :

৯ই জিলহজ্বের ফজর থেকে ১৩ই জিলহজ্বের আছর পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ ওয়াক্তের প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। জামা'আতে নামায হোক বা একাকী সর্বাবস্থায় বলতে হবে। পুরুষ হোক বা নারী সকলকে বলতে হবে–

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

এই তাকবীর জোর আওয়াজে বলা ওয়াজিব। তবে মহিলাগন আস্তে আস্তে বলবে। নামাযের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে এই তাকবীর বলতে হবে। ইমাম বলতে ভূলে গেলে মুক্তাদীগন সাথে সাথে বলবে- ইমামের বলার অপেক্ষা করবে না। তাকবীরে তাশরীক একবার বলা ওয়াজিব। তিনবার বলা সুন্নাত নয়।

ঈদুল আযহার দিনের সুন্নাতসমূহ :

* ভোরে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা।
* মেসওয়াক করা।
* উত্তমরূপে গোসল করা।
* যথাসাধ্য উত্তম পোশাক পরিধান করা।
* শরীআত সম্মত সাজ-সজ্জা করা।
* খুশবূ লাগানো।
* ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু না খাওয়া।
* সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া।
* ঈদগাহে যেয়ে ঈদের নামায পড়া। বিনা ওজরে মসজিদে না পড়া।
* পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া।
* তাকবীরে তাশরীক জোরে জোরে পড়তে থাকা।
* এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া, অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা। যদি সম্ভব হয়।
* যেখানে ঈদের নামায পড়া হবে সেখানে ওই দিন অন্য কোনো নফল নামায পড়া মাকরূহ, চাই ঈদের নামাযের পূর্বে হোক বা পরে। আর ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরেও কোনো নফল নামায পড়া মাকরূহ।

কুরবানী করা ওয়াজিব :

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরতের পর প্রত্যেক বছরই কুরবানী করেছেন। কোন বছর কুরবানী পরিহার করেন নি। যে আমল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাগাতার করেছেন, কোনো সেময় ছেড়েদেননি, এটিই সে আমল ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ। তাছাড়াও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানী ত্যাগকারীদের উপর অভিসম্পাত ব্যক্ত করেছেন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন যে কুরবানী করবেনা (কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও)সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। এছাড়াও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকেও কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুরবানীর ফজীলত :

হযরত যায়দ ইবনে আরকম (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে জিজ্ঞেস করেছেন কুরবানী কি? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, কুরবানী হলো তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সুন্নাত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন এতে আমাদের ছওয়াব কি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কুরবানীর জন্তুর প্রত্যেক পশমের বদলাতে একটি করে ছওয়াব রয়েছে। পশমদার জন্তু (ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, বলেন ভেড়ারও প্রত্যেক পশমের বদলাতে এক একটি ছওয়াব পাওয়া যাবে। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত আয়শা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন কুরবানীর দিন কুরবানীর চাইতে উত্তম ও প্রিয় কোনো আমল নেই। কিয়ামত দিবসে কুরবানীর জন্তুকে শিং, পশম এবং খুরসহ পেশ করা হবে এবং কুরবানীর জন্তুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হয়ে যায়, তাই তোমরা খুব আনন্দ চিত্তে কুরবানী কর।

যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব :

(ক) ১০ই জিলহজ্বের ফজর থেকে ১২ই জিলহজ্বের সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্থ্যাৎ কুরবানীর দিনগুলোতে যার নিকট সদকায়ে ফিতর/ ফিতরা ওয়াজিব হওয়া পরিমান অর্থ/ সম্পদ থাকে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

(খ) কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয়- সন্তানাদী, মাতা-পিতা ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয় না।

(গ) যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় সে কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করলে সেই পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

(ঘ) কোনো উদ্দেশ্যের জন্য কেউ কুরবানীর মান্নত করলে এবং সে উদ্দেশ্য পূর্ন হলে তার উপর (গরীব হোক বা ধনী হোক) কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়।

(ঙ) যার উপর কোরবানী ওয়াজিব সে কুরবানী না করলে কুরবানীর দিনগুলো চলে যাওয়ার পর একটা বকরীর মূল্য সদকা করা ওয়াজিব।

যে সকল জন্তু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয :

(ক) বকরী, পাঠা, খাসী , ভেড়া, ভড়ী, দুম্ভা, গাভী, ষাড়, বলদ, মহিষ, উট - এই কয় প্রকার গৃহপালিত জন্তু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয।

কুরবানীর জন্তুর বয়স:-

(ক) বকরী, খাসী, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্ভা কমপক্ষে এক বৎসর বয়সের হতে হবে। বয়স যদি কিছু কমও হয় কিন্তু এরূপ মোটাতাজা যে, এক বৎসর বয়সীদের মাঝে ছেড়ে দিলে তাদের চেয়ে ছোট মনে হয় না, তাহলে তার দ্বারা কুরবানী জায়েয আছে। তবে অন্তত: ছয় মাস বয়স হতে হবে। বকরীর ক্ষেত্রে এরূপ ব্যতিক্রম নেই। বকরী কোন অবস্থায় এক বৎসরের কম হতে পারবে না।

(খ) গরু মহিষের বয়স কমপক্ষে ২ বৎসর হতে হবে।

(গ) উট এর বয়স কমপক্ষে পাচঁ বৎসর হতে হবে।

কুরবানীর পশুর স্বাস্থ্যগত অবস্থা:-

(ক) কুরবানীর পশু ভাল এবং হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উত্তম।

(খ) যে প্রানী লেংড়া অর্থ্যাৎ যা তিন পায়ে চলতে পারে- এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা রাখতে পারলেও তার উপর ভর করতে পারে না- এরূপ পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই।

(গ) যে পশুর একটি দাতঁও নেই তা দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই।

(ঘ) যে পশুর কান জন্ম থেকেই নেই তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়।

(ঙ) যে পশুর শিং মূল থেকে ভেঙ্গে যায় তা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নেই।

(চ) যে পশুর উভয় চোখ অন্ধ বা একটি চোখ পূর্ন অন্ধ বা একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশী নষ্ট তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়।

(ছ) যে পশুর একটি কান বা লেজের এক তৃতিয়াংশ কিংবা তার চেয়ে বেশী কেটে গিয়েছে তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নহে।

(জ) অতিশয় কৃশকায় ও দুর্বল পশু যার এতটুকু শক্তি নেই যে, জবেহের স্থান পর্যন্ত হেটে যেতে পারে তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়।

(ঝ) ভাল পশু ক্রয় করার পর এমন দোষক্রুটি দেখা গিয়েছে যার কারনে কুরবানী দুরস্ত নয়- এমতাবস্থায় ওই জন্তু রেখে অন্য একটি জন্তু ক্রয় করতে হবে। তবে ক্রেতা গরীব হলে সেটিই কুরবানী দিতে পারবে।

(ঞ) গর্ভবতী পশু কুরবানী করা জায়েয। যদি পেটের বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তবে সে বাচ্চাও জবেহ করে দেবে। তবে প্রসবের নিকটবর্তী হলে সেরূপ পশু কুরবানী করা মাকরুহ।

(ট) বন্ধা পশু কুরবানী করা জায়েয।

শরীকী কুরবানীর বিধানাবলী :

(ক) বকরী, খাসি, পাঠা ,ভেড়া, ভেড়ী ও দুম্ভায় একজনের বেশী শরীক হয়ে কুরবানী করা যায় না। এগুলো একটা একজনের নামেই কুরবানী হতে পারে।

(খ) একটা গরু, মহিষ ও উটে সবোর্চ্চ সাতজন শরীক হতে পারে। সাতজন হওয়া জরুরী নয়, দুইজন বা তিনজন বা চারজন বা পাচঁজন বা ছয়জন কুরবানী দিতে পারে, তবে কারো অংশ সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হতে পারবে না।

(গ) মৃতের নামেও কুরবানী হতে পারে।

(ঘ) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার বিবিগন ও

বুজুর্গদের নামেও কুরবানী হতে পারে।

(ঙ) যে ব্যক্তি খাটি অন্তরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করে না বরং গোশত খাওয়া বা লোক দেখানো ইত্যাদি নিয়তে কুরবানী করে , তাকে অংশীদার বানিয়ে কোন পশু কোরবানী করলে সকল অংশীদারদের কুরবানীই নষ্ট হয়ে যায়। তাই শরীক নির্বাচনের সময় খুবই সর্তক থাকা আবশ্যক।

(চ) কুরবানীর পশু ক্রয় করার সময় শরীক রাখার ইচ্ছা ছিল না, পরে শরীক গ্রহন করতে চাইলে ক্রেতা গরীব হলে তা পারবে না, অন্যথায় পারবে।

(ছ) যার সমস্ত উপার্জন বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম, তাকে শরীক করে কুরবানী করলে অন্যান্য সকল শরীকের কুরবানী অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

কুরবানীর পশু জবেহ সংক্রান্ত :

(ক) নিজের কুরবানীর পশু নিজেই জবেহ করা উত্তম। নিজে জবেহ না করলে বা করতে না পারলে জবেহের সময় সামনে থাকা ভাল। মেয়েলোকের পর্দার ব্যাঘাত হবার কারনে সামনে না থাকতে পারলে ক্ষতি নেই।

(খ) কুরবানীর পশুকে মাটিতে শুইয়ে তার মুখ কেবলামুখী করে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবেহ করতে হবে।

জাবাইয়ের পূর্বে এই দু'আ পাঠ করবে:

انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين، لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم منك ولك

(গ) কুরবানী দাতা বা কুরবানী দাতাগনের নাম মুখে উচ্চারন করা, কাগজে লিখে পড়া জরুরী নয়। আল্লাহ পাক জানেন, এটা কার কুরবানী। সে অনুযায়ীই উক্ত কুরবানী গৃহীত হবে।

(ঘ) কুরবানীর পশু রাতের বেলায়ও জবেহ করা জায়েয, তবে ভাল নয়।

(ঙ) ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয নেই। তবে যেখানে জুম'আ ও ঈদের নামায দুরস্ত নয় সেখানে সুবহে সাদেকের পর থেকেই কুরবানী করা জায়েয আছে।

গোশত বন্টন :

(ক) অংশীদারগন সকলে একান্নভুক্ত হলে গোশত বন্টন করা প্রয়োজন নেই। অন্যথায় বন্টন করতে হবে।

(খ) অংশীদারগণ গোশত অনুমান করে বন্টন করবে না বরং পাল্লা দিয়ে ওজন করে বন্টন করতে হবে। অন্যথায় ভাগের মধ্যে কমবেশ হলে গোনাহগার হবে। অবশ্য কোনো অংশীদার মাথা, পায়া ইত্যাদি বিশেষ কোন অংশ গ্রহন করলে তার ভাগে গোশত কিছু কম হলেও তা দুরস্ত হবে, কিন্তু যে ভাগে গোশত বেশী সে ভাগে মাথা, পায়া ইত্যাদি বিশেষ অংশ দেওয়া যাবে না।

(গ) অংশীদারগণ সকলে যদি সম্পূর্ণ গোশত দান করে দিতে চায় বা সম্পূর্ণটা রান্না করে বিলাতে বা খাওয়াতে চায় তাহলে বন্টনের প্রয়োজন নেই।

(ঙ) যদি কয়েক শরীক মিলে ঈসালে ছাওয়াবের জন্য এক ভাগ কুরবানী করতে চায় তাও পারা যাবে। তবে সে ক্ষেত্রে সকল শরীকের টাকাগুলো জমা করে এক শরীকদারকে হেবা করতে হবে। সে নিজের পক্ষ থেকেই কুরবানী দিবে। তখন একজনের পক্ষ থেকে কুরবানীর অংশিদারীত্ব থাকবে কিন্তু ছওয়াব সকলে পাবে।

কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া ও দান করা :

(ক) কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া, পরিবারবর্গকে খাওয়ানো, আত্মীয়স্বজনকে দেওয়া এবং গরীব মিসকীনকে দেয়া সবই জায়েজ। মোস্তাহাব ও উত্তম তরীকা হলো তিনভাগ করে একভাগ নিজের জন্য রাখা, একভাগ আত্মীয়স্বজনকে দেওয়া এবং একভাগ গরীব মিসকীনকে দেওয়া।

(খ) মান্নতের কুরবানীর গোশত হলে নিজে খেতে পারবে না এবং সম্পদশালী-ধনীকেও দিতে পারবে না বরং পুরোটাই গরীব-মিসকিনকে দান করে দেয়া ওয়াজীব।

(গ) যদি কোন মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে কুরবানীর জন্য ওয়াসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে সেই কুরবানীর গোশতও মান্নতের কুরবানীর গোশতের ন্যায় পুরোটাই দান করা ওয়াজিব।

(ঘ) কুরবানীর গোশত বা বিশেষ কোন অংশ (যেমন মাথা) পারিশ্রমিকরূপে দেয়া জায়েয নেই।

(ঙ) কুরবানীর গোশত শুকিয়ে বা ফ্রিজে রেখে দীর্ঘদিন খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

কুরবানীর পশুর চামড়া :

(ক) কুরবানীর পশুর চামড়া শুকিয়ে বা প্রক্রিয়াজাত করে নিজেও ব্যবহার করা জায়েয।

(খ) কুরবানীর চামড়া খয়রাতও করা যায়, তবে বিক্রি করলে সে পয়সা নিজে ব্যবহার করা যায় না- খয়রাতই করা জরুরী এবং ঠিক ওই পয়সাই খয়রাত করতে হবে। ওই পয়সাটা নিজে খরচ করে অন্য পয়সা দান করলে আদায় হবে বটে, তবে অন্যায় হবে।

(গ) কুরবানীর চামড়ার দাম মসজিদ মাদ্রাসার নির্মান কাজে বা বেতন বাবত বা পারিশ্রমিক বাবত বা অন্য কোন নেক কাজে খরচ করা দুরস্ত নয়। খয়রাতই করতে হবে।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী

☆ গোনাহের দ্বারা ইবাদতের নূর নষ্ট হয়ে যায় :

হযরত (রহ.) বলেন, প্রত্যেক মুসলমান অর্ধেক অলী। কেননা তাদের ভিতর ঈমানের সম্পদ আছে। পরিপূর্ণ অলি হবে যখন গোনাহ ছেড়ে দিবে এবং নেক কাজ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি নেকীর সাথে গোনাহেও লিপ্ত তার উদাহরণ হল ওই ট্যাংকির ন্যায় যাতে পানি ভর্তি করা হচ্ছে কিন্তু তার নল খোলা। একথা স্পষ্ট যে, এ ধরনের টাংকিতে পানি জমা থাকবে না বরং সব পানি বের হয়ে যাবে অনুরূপভাবে নেক আমলের সাথে গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত। তার মধ্যে আমলের নূর কোনো দিন পরিপূর্ণ হবে না।

☆ হযরত বলেন, একজন কাপড় ব্যবসায়ী কুদৃষ্টির রোগে আক্রান্ত ছিল মারাত্মকভাবে তিনি নিজের সংশোধনের পরামর্শ চাইলে আমি প্রতিবার কুদৃষ্টির জন্য তার উপর ৫টাকা জরিমানা নির্ধারন করলাম এবং পত্র লেখলাম যে, প্রতি দশ দিনের কুদৃষ্টির সংখ্যা এবং জরিমানার টাকা যেন হারদুঈতে পাঠিয়ে দেয়। এ টাকা গুলো নিজে ফকিরদের মধ্যে বণ্টন করবে না। বরং আমাকে উকিল বানিয়ে দেবে আমি ফকীরদের সদকা করার দশ দিন পর তার চিঠি আসল যে,আমার দৈনিক আয় আনুমানিক ৫০ টাকা। এখন আমি যদি দশবার কুদৃষ্টি করি তখন সব আয় জরিমানাতেই চলে গেল। আমি ও আমার পরিবার পরিজন কি খাব? তাই খুব হিম্মতের সাথে চেষ্টা করল এবং ১০ দিন পার হয়ে গেল একবারও কুদৃষ্টি হয়নি। আল্লাহ পাক উক্ত তদবীরের বরকতে রোগ থেকে মুক্তি দান করলেন।

☆ হযরত (রহ.) বলেন, যদি কারো তিন জন বন্ধু থাকে, একজন বলে যে, তোমার সাথে আমার অবস্থান এবং সদাচরণ তোমার শরীরে জান থাকা পর্যন্ত অটুট থাকবে। দ্বিতীয়জন বলে যে, আমি তোমার সাথে তোমাকে কবরস্থানে নেওয়া পর্যন্ত থাকব। তৃতীয় জন বলে যে, আমি কবরের ভিতরেও তোমার সাথে থাকব। এখন আপনি কোন বন্ধুকে বেশি ভালবাসবেন? প্রথম বন্ধুটি হলো মাল তথা অর্থ-সম্পদ, দ্বিতীয় বন্ধু পরিবার পরিজন এবং তৃতীয় বন্ধু হচ্ছে নেক আমল। তাই নেক আমলের চিন্তা অর্থ সম্পদ ও পরিবার পরিজন অপেক্ষা বেশি হওয়া দরকার।

☆ হযরত (রহ.) বলেন, চিকিৎসার দ্বারা উপকার হয়। কিন্তু চিকিৎসা যদি না করে তখন ডাক্তারও অসুস্থ থেকে যায়। অনুরূপভাবে রিয়া তথা লোক দেখানো অভ্যাস, অতিমাত্রায় রাগ, তাকাব্বুর অহংকারের মত রোগ আলেম হয়ে গেলেও চলে যায় না। বরং পূর্বের তুলনায় আরো বেড়ে যায়। বংশগত অহংকারতো আছেই, এখন ইলম সংযুক্ত হওয়ার কারণে তার মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। এর সাথে যদি কিছু ইবাদত বন্দেগী করতে থাকে তখন এই রোগ আরো বৃদ্ধি পাবে। এতে বোঝা গেল রোগ থেকে মুক্তি চিকিৎসা দ্বারা হয় ইলম ও ইবাদত দ্বারা নয়।

☆ হযরত (রহ.) বলেন, আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (রহ.) লেখেছেন, যখন মানুষ কিছু যিকির ও ইবাদতে মগ্ন হয় তখন মনে করে যে, আমি তো শয়তান থেকে মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু তার এই ধারণা ভুল। কেননা যখন সে গাফেল এবং ফাসেক ছিল এবং নেক আমল ছিল না তখন শয়তান তার কাছে আসার তো কোনো প্রয়োজনও মনে করতো না। এখন আসবে। কেননা তার যোগ্যতার মধ্যে উন্নতি হচ্ছে। যার কাছে অর্থসম্পদ বেশি হয় তার কাছেই চোর-ডাকাত আসে। একজন রাফেজী (শিয়া) একজন সুন্নী মুসলমানকে বলল যত ফেৎনা, নবুওয়াতের দাবী ইত্যাদি ওঠে সব সুন্নিদের মাঝে ওঠে। তখন সুন্নী মুসলমান তার উত্তরে বলল, শিয়াদেরতো শয়তান নিজের পথে উচু স্থানে নিয়ে গেছে, তাই শিয়াদের ব্যাপারে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। এখন সে সুন্নীদের পেছনে পড়ে থাকে, যেন তাদেরকেও গোমরাহ করতে পারে।

☆ হযরত (রহ.) বলেন, একজন আলেমে রব্বানী তথা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর হাতে তাবলীগী জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে মাদরাসার অবদান এবং তার বাস্তবতাকে অবশ্যই মানতে হবে। অনুরূপভাবে তিনি একজন আল্লাহ ওয়ালার কাছে আত্মশুদ্ধি করেছেন। তাই খানকার অবদান এবং তার বাস্তবতাকে ও স্বীকার করা আবশ্যক। যদি কোনো গাইরে আলেমের দ্বারা এই জামা'আতের ভিত্তিস্থাপন হত তবে আজ পর্যন্ত অসংখ্য গোমরাহীর প্রচার প্রসার হতো। তাই দ্বীনের তিনটি বিভাগ, তা'লীম, তাজকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি, তাবলীগ এর প্রত্যেক বিভাগের লোকদের পরস্পরকে সহযোগী এবং বন্ধু মনে করতে হবে। যেমন ডাক বিভাগে কেউ সিলমোহরের কাজ করে কেউ রেজিস্টারী আবার কেউ পার্সেলের কাজ আঞ্জাম দেয়। অর্থাৎ সবার সমন্বয়ে বিভাগের কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। অনুরূপভাবে দ্বীনি কাজের বেলায় একে অপরের সহযোগী হতে হবে। এতে দ্বীনের কাজ সুন্দরভাবে চলবে।

অনুবাদ : **মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল**
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

মালফূযাতে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

(হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম-এর বসুন্ধরা মারকাযের জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনের উদ্দেশে এবং বিভিন্ন মাহফিলে দেওয়া সমসাময়িক বিভিন্ন মাওয়ায়েয ও বয়ান থেকে সংগৃহীত)

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) বলেন, যখনই কোনো গাইরে আলেম সুযোগ পায় ওলামায়ে কেরামের উপর আক্রমণ করে বসে। একদা কোনো ব্যাংকের ডাইরেক্টর কোন এক মিটিংয়ে বলে উঠলেন, কারো উপর যদি অন্য কোনো ব্যক্তির হক রয়ে যায় তখন হক্বদার থেকে মাফ চাওয়া ছাড়া আল্লাহ তা'আলা তা মাফ করেন না। কিন্তু উলামায়ে কেরাম একথা বলেন না যে, হক্বদার থেকে মাফ চাইতে হবে। বরং ওলামায়ে কেরাম বলেন তওবা কর, তওবা কর। শুধু তওবা করার কথাই বলে থাকেন। একথার জবাবে হযরত ওয়ালা বললেন, আমাদের ভাই যে কথা বললেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক। হক্বদারের মাফ করা ব্যতীত অন্যের হক মাফ হবে না। একমাত্র হক্বদারের কাছ থেকেই মাফ নিতে হবে। তবে তওবা করার দ্বারা আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্যতার যে গোনাহ হয়ে গেছে তা মাফ হবে। বান্দার হক্ব মাফ হবে না। অতঃপর শ্রুতাদের উদ্দেশ্যে হযরত বলেন, আমি আপনাদের সামনে যে কথাটা পেশ করলাম তা ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকেই শুনে বলেছি। যদি ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে শোনার সুযোগ না হতো আমি আপনাদেরকে বলতে পারতাম না। আর আমাদের যে ভাই কথাটা বলেছেন "হক্বদারের মাফ করা ছাড়া অন্যের হক্ব মাফ হবে না" এই কথাটাও তিনি হয়ত কোনো আলেমের কাছ থেকে শুনেই বলেছেন। এ কথা শুনে মজলিসের সবাই হেসে উঠলেন।

উপর্যুক্ত ঘটনা বর্ণনা করে হযরত ওয়ালা বললেন, আমরা ক'জন আলেমের কাছে যাই? কতটুকু সময় কাটাই? তাহলে আমরা কীভাবে শুনব? আমরাও অনেকবার "বান্দার হক্ব" এর ব্যাপারে বলেছি। এক জুমার দিন আসরের পর শুধু এই বিষয়েই বয়ান হয়েছিল। আসলে কথা হল গাইরে আলেম লোক যখনই সুযোগ পায় আলেমদের উপর আক্রমন করে বসে। এটা মারাত্মক ক্ষতির বিষয়। তা থেকে সবার বেঁচে থাকা উচিৎ। যদি কোনো আলেমের ব্যাপারে আপনি আশ্বস্ত না হন অথবা আপনার ভাল না লাগে তখন উনার কাছ থেকে দুরে থাকবেন। এটাই আপনার জন্য কল্যাণকর।

হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, যদি কারো কোনো আল্লাহ ওয়ালা বা কোনো আলেমের ব্যাপারে আপত্তি থাকে অথবা পছন্দ না হয় তখন তার উচিৎ উক্ত আল্লাহ ওয়ালা ও আলেম থেকে দূরে থাকা। অনর্থক বদগুমানী (কুধারণা) করে নিজের দ্বীন নষ্ট করার কী প্রয়োজন?

☆ হযরত (দা.বা.) বলেন, যে সব বন্ধু-বান্ধব দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন অস্থিরতা ও পেরেশানী নিয়ে এখানে জুমাবার আসরের পর দু'আয় শরীক হওয়ার জন্য আসেন, আর আমরা যারা এখানে এসেছি শুধু তারাই কি পেরেশানীতে লিপ্ত? দুনিয়াতে কি আর কেউ বালা-মুসিবতে লিপ্ত নেই? অবশ্যই আছে। ছোট থেকে বড় সবাই পেরেশানীতে লিপ্ত। সব লোকের পেরেশান হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে পেরেশানী/অস্থিরতা দূর হবে এর মধ্যে মতানৈক্য। একেক ব্যক্তি একেক পদ্ধতি অবলম্বন করে। কেউ মানসিক ডাক্তারের কাছে যায় এই মনে করে যে, এতে তার পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। কেউ কেউ ঘুমের বড়িকে পেরেশানী দূর হওয়ার মাধ্যম বুঝে নিয়েছে। হয়ত যখন ঘুম থেক জাগ্রত হবে পেরেশানী থাকবে না। আর কিছু লোক আমেলের কাছে যায়। যাতে তদবীরের দ্বারা তার অস্থিরতা দূর হয়ে যায়।

☆ হযরত ওয়ালা বলেন, ঢাকা শহরে কতজন আমেল আছে আমার জানা নেই। যাদের এ ব্যাপারে জানা আছে তারাই বলতে পারেন। তাদের কাছে মানুষ লাইন ধরে তদবীর নেয়। আমেলদের হাজার পাঁচশ টাকাও দিতে হয়। তারপরও লোকেরা তাদের কাছে গিয়ে ভিড় করে এ জন্য যে, হয়ত তদবীরের দ্বারা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। প্রশান্তি হাসিল হবে। আর কিছু লোক এমনও আছে যারা পেরেশানী থেকে মুক্তির জন্য ফরজ নামাযের পর গুরুত্বের সাথে দু'আ করে, তাহাজ্জুদের নামায পড়ে কান্নাকাটি করে, আল্লাহ তা'আলার কাছে চায় এবং এখানে (মারকায মসজিদে) জুম'আ দিন বাদ আসর দু'আয় শরীক হওয়ার জন্য আসে। যে সব লোক পেরেশানী থেকে মুক্তির জন্য মানসিক ডাক্তারের কাছে যায়, ঘুমের বড়ি খায় অথবা আমেলের কাছে যায়, তাদের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে পাইতেও পারে। যদি মুক্তি পায় তাহলে একটি লাভ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু পাবে না, সওয়াব হাসিল হবে না। আর যদি অস্থিরতা দূর না হয় তাহলে ডাবল ক্ষতি: টাকা পয়সা নষ্ট হল আবার

আল্লাহর কাছেও কিছু পাওয়া গেল না। আমাদের চট্টগ্রামে একটি প্রবাদ আছে, বলা হয় দাড়িও সুন, কড়িও সুন" অর্থাৎ দাড়িও নষ্ট কড়ি তথা পয়সাও নষ্ট। প্রথমে কড়ির আবিষ্কার হয় পরে পয়সার আবিষ্কার হয়। এই প্রবাদটি তখন বলা হত যখন কোনো ব্যক্তি পয়সার বিনিময়ে দাড়ি কামাইত। এখন কোনো ব্যক্তি পয়সার বিনিময়ে দাড়ি কামাইলে তার দুই ক্ষতি ১. দাড়ি কামানোর গোনাহ করা ২. পয়সা নষ্ট করা।

☆ হযরত বলেন, একজন মুসলমান কখনও দাড়ি মুণ্ডিয়ে ফেলতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা পুরুষের সৌন্দর্য হিসেবে দাড়ি দান করেছেন। মহিলাদেরকে দাড়ি দেওয়া হয়নি। আল্লাহ পাক তো দাড়িকে পুরুষের জন্য সৌন্দর্য মনে করলেন আর যারা দাড়ি ছাঁটে তারা সৌন্দর্য না মনে করল যেন সে আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তকে ভুল সাব্যস্ত করল। এটাতো বড়ই অজ্ঞতা ও মুর্খতার পরিচয়। যদি কোনো ব্যক্তি মেশিন আবিষ্কার করে অতঃপর অন্য কোনো ব্যক্তি যদি এসে বলে, মেশিনের অমুক পার্টস এর প্রয়োজন নেই অথবা অমুক পার্টস অনর্থক তখন সবলোক তাকে পাগল বলবে। এরকম মেকানিক সম্পর্কে বলবে যে, অভিজ্ঞ মেকানিক নয়, তাকে পাগল বলবে। তাই বলে তো সে বলছে অমুক পার্টসের প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি মেশিন তৈরী করেছে সে তো অভিজ্ঞ মেকানিক। প্রয়োজন মনে করেই তো পার্টসের সংযোজন করেছে। বিনা প্রয়োজনে তো পার্টসের সংযোজন করেনি।

অতএব আল্লাহ তা'আলা যখন পুরুষের জন্য ভাল ও সৌন্দর্য মনে করে দাড়ি দান করেছেন, এখন তাকে অসুন্দর মনে করে মুণ্ডিয়ে ফেলা মুর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। একজন মুসলমান তাঁ করতে পারে না।

☆ ইরশাদ করেন, যে সব লোক পেরেশানী দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ চায়। ফরজ নামায ও তাহাজ্জুদের পর দুআ করে ওলামায়ে কেরামের সাথে এসে দু'আতে শরীক হয় তাদের অনেক দিক দিয়ে ফায়দা হয়। ১. অস্থিরতা চলে যায়। ২. টাকা পয়সা খরচ হয় না। ৩. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সওয়াব পাওয়া যায়। ৪. কোনো ক্ষতি বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

☆ যে সব দোস্ত আহবাব ওলামায়ে কেরামের সাথে দু'আয় শরীক হওয়ার জন্য দুর-দুরান্ত থেকে গাড়ী নিয়ে আসেন তারা প্রতিটি কদমের বদলায় সওয়াব পাবেন। হযরত ওয়ালা হারদূঈ (রহ.) বলতেন گاڑی لیکر جنت کی طرف چلو۔ গাড়ী নিয়ে বেহেশতের দিকে চলো। গাড়ী নিয়ে মসজিদে যাওয়া এটা বেহেশতের দিকে যাওয়া। অতএব যখন বেহেশতের দিকে যাওয়া হল। প্রতিটি কদমে সওয়াব পাওয়া যাবে। এখানে (মারকাযে) যারা লেখাপড়া করছে, তারা সবাই আলেম। অন্যান্য মাদরাসাসমূহ থেকে দাওরায়ে হাদীস শেষ করে মওলানা হয়ে এসেছে। উচ্চশিক্ষা হাসিল করার জন্য এসেছে। আর আপনারা ওলামায়ে কেরামের সাথে নামায পড়তে আসলেন। ওলামায়ে কেরামের সাথে নামায আদায় খোদ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে নামায পড়ার ন্যায়। তাদেরকে সম্মান করা মানে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সম্মান করা। কারণ ওলামায়ে কেরাম নবীর উত্তরাধিকারী।

বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, একদা হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আজকে আপনার মেহমান। (হয়ত ঘরে খাওয়ার কোনো জিনিস ছিলনা অথবা অন্য কোনো কারণে বলেছেন) তখন নবীজী উম্মুহাতুল মুমিনীন এর কাছে গিয়ে খানা তালাশ করলেন। কারো ঘরে কোনো খানা ছিল না। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বললেন, আমার একজন মেহমান আছে, কেউ কী তাঁর মেহমানদারী করতে পারবে? জনৈক সাহাবী দাড়িয়ে আজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তৈরী আছি। তখন সাহাবী মেহমানকে সাথে নিয়ে বাড়ী গেলেন। বিবিকে বললেন, আজ তোমার জন্য বড়ই সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। আপনাদের ধারণা (হয়ত বিবি মনে করেছে উন্নতমানের কোনো জিনিস আনা হয়েছে। হ্যাঁ এযুগের মহিলারা তাই মনে করত। কিন্তু সে যুগের মহিলারা এ রকম ছিলনা। স্বামী বললেন, আমার সাথে যিনি এসেছেন উনি রাসূলের মেহমান। আর প্রকৃত অর্থে রাসূলের মেহমানের মেহমানদারী করা খোদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেহমানদারী করা। এরপর সাহাবী বিবির কাছে খাওয়ার কোনো কিছু আছে কিনা জানতে চাইলেন। বিবি বললেন, কোনো খাবার তো নেই। তবে বাচ্চার খাওয়ার জন্য অল্প যব (যাউ) আছে। সাহাবী বললেন, মেহমানের জন্য সেই খানাই পেশ করে দিবে। আমরাও মেহমানের সাথে দস্তরখানায় বসে যাব। যখন খানার দস্তরখানা রাখবে তখন চেরাগ নিভিয়ে দিবে। আমরা খানা চাবানোর আওয়াজ করব। যাতে মেহমান মনে করে আমরাও তার সাথে খানা খাচ্ছি। আর খানার পাত্র উনার দিকে ঠেলে দিতে থাকব। এর পূর্বে বাচ্চাকে শুইয়ে দেওয়া হবে। মিয়া বিবির পরামর্শমতে মেহমানকে খানা খাওয়ানো হল। মেহমান পেটভরে খেলেন। সাহাবী যখন মসজিদে নববীতে ফজরের নামায আদায় করতে গেলেন। নবীজী দেখে মুচকি হেসে বললেন তোমাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ তা'আলা জেনে ফেলেছেন। আল্লাহ পাক তোমারা মিয়া-বিবির সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেছেন। ويوثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة۔

গ্রন্থনায় :

মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান

“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ-৩

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

রাসূল (সা.) কর্তৃক কিয়াস করণঃ

ক) এক ব্যক্তি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে জৈবিক চাহিদা পূরণ করে, এতেওকি সে সওয়াব লাভ করবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তোমার কি ধারণা, সে যদি হারাম পন্থায় তার চাহিদা পূরণ করতো তাহলে কি গোনাহগার হতো না? লোকটি বলল, হ্যাঁ তাতো হতো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ঠিক তেমনি বৈধভাবে বাসনা পূরণের মাধ্যমেও সওয়াব লাভ করবে। কি মনে কর? তোমাদের মন্দের বদলা দেওয়া হবে আর ভালোর প্রতিদান দেওয়া হবে না।... (মুসলিম শরীফ ১০০৬)

খ) এক ব্যক্তি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি কালোবর্ণের সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। (অথচ আমরা স্বামী স্ত্রী কেউ কালো বর্ণের নই) নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি উট আছে? সে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিল। জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কি বর্ণের? বলল, লাল বর্ণের। জানতে চাইলেন, লাল উটের গর্ভজাত ছাই বর্ণের উট নেই? বলল, আছে। জিজ্ঞেস করলেন, (লালবর্ণের নরমাদীর প্রজনন সত্বেও তাদের গর্ভজাত ছাই রঙা উট) কোথা থেকে আসল? বলল কোনোও রগ তাকে টেনে এনেছে। (অর্থাৎ পূর্বে তার বংশে এই বর্ণের উট ছিল।...) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তোমার এই ছেলেকেও হয়তো কোনো রগ টেনে এনেছে। (বুখারী শরীফ ৫৩০৫, ৬৮৪৭)

এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশ্নকারীকে কিয়াসের মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন যে, লাল উট কখনও ছাই বর্ণের উট জন্ম দেয় যখন তার বংশে এই বর্ণের উট থাকে। তেমনি ফর্সা দম্পতির সন্তানও কালো বর্ণের হয় যখন তার উর্ধ্বতন কেউ কালো বর্ণের থাকে।

গ) হযরত উমর ফারুক (রা.) একবার নবীজীর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমি বড় একটি অপরাধ করে ফেলেছি। আমি রোযা রেখে স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, তোমার কি ধারণা তুমি যদি রোযা অবস্থায় পানি দিয়ে কুলি করতে (তাহলে রোযার কোনো ক্ষতি হতো?) হযরত উমর (রা.) বললেন, না এতে তো কোনো ক্ষতি দেখছি না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, চুম্বন ও অনুরূপ একটি ব্যাপার। (সহীহ সনদে সুনানে আবু দাউদ ২৩৮৫)

ঘ) জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট জানতে চাইলেন, আমার মা হজ্বের মান্নত করেছিল। কিন্তু হজ্ব না করেই তিনি মারা গিয়েছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্ব করব? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্ব কর। তোমার মায়ের ওপর কোনো ঋণ থাকলে তুমি কি তা আদায় করতে না? (অবশ্যই করতে) কাজেই তোমরা আল্লাহর ঋণও আদায় কর। আল্লাহ তা'আলা ঋণ আদায়ের অধিক হক্বদার। (বুখারী শরীফ ১৮৫২)

ঙ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বংশ সম্পর্কের কারণে যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন দুধপান জনিত কারণেও তাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। (জামে তিরমিযী ১১৪৬)

এখানে দুধপানজনিত সম্পর্ককে বংশসম্পর্কের ওপর কিয়াস করা হয়েছে।

চ) বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক নাপাক এ সম্পর্কে নবীজীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি একটি আয়াতের ওপর কিয়াস করে (যেখানে বারবার অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করা কঠিন হওয়ার নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ের জন্য তা শিথিল করা হয়েছে) বিড়ালের উচ্ছিষ্টকে পাক বলেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৯২, কুরতুবী ১২/২৮০)

রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় সাহাবা কর্তৃক কিয়াস :

১. হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)কে ইয়ামানে প্রেরণ করার সময় নবীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ দ্বারা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, যদি কিতাবুল্লাহয় না পাও? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ দ্বারা। আবার বলা হল যদি কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাহ কোনোটিতে না পাও? তিনি জবাব দিলেন, আমি আমার রায় দ্বারা গবেষণা করে ফায়সালা করবো এবং চেষ্টার কমতি করবো না। তাঁর এ জবাবে নবীজী অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করলেন। (সুনানে আবু দাউদ ৩৫৯২)

এখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) এর জীবদ্দশাতেই কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। কারণ হাদীস দৃষ্টে বোঝা যায় উম্মত এমন বিষয়েরও সম্মুখীন হবে যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহয় সুস্পষ্টরূপে থাকবে না। সে ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর সিদ্ধান্তটি কিয়াস করেই উদঘাটন করতে হবে।

২. হযরত আম্মার (রা.) এর বর্ণনা তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এক যুদ্ধে পাঠালেন। এক পর্যায়ে আমার গোসল ফরজ হল। গোসল করব এ পরিমাণ পানিও ধারে কাছে ছিল না। এজন্য গোসলের বিকল্প হিসেবে আমি মাটিতে গড়াগড়ি খেলাম ঠিক যেমন কোনো প্রাণী মাটিতে গড়াগড়ি খায়। মদীনা ফিরে আমি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করলাম। শুনে তিনি বললেন, তোমার জন্য দুই হাত মাটিতে মেরে (ধুলা-বালি) ঝেড়ে মুখমণ্ডল আর দুই হাত (কনুই পর্যন্ত) মাসাহ করে নিলেই যথেষ্ট ছিল। (মুসলিম শরীফ ১৬১)

দেখা যাচ্ছে হযরত আম্মার (রা.) ওজুর তায়াম্মুমের ওপর গোসলের তায়াম্মুমকে কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ ওজুর বদলে যেমন তায়াম্মুম হয় গোসলের বদলেও তায়াম্মুম হবে। কিন্তু কিয়াসে সামান্য ভুল হওয়ায় নবীজী তা শোধরে দিয়েছিলেন। যে তোমার কিয়াস তো ঠিক কিন্তু গোসলের তায়াম্মুম ওজুর তায়াম্মুম এর মতই হবে। ভিন্ন রকম হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য কিয়াস করতে তাকে নিষেধ করেন নি।

এ ঘটনা এক মস্তবড় দলীল যে, সাহাবায়ে কেরামও বিধান-অজ্ঞাত বিষয়ের সম্মুখীন হলে তার সমাধানে কিয়াসের সহায়তা নিতেন।

এসমস্ত দলীল প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হল কিয়াস শরীয়তের মজবুত দলীল। এ ছাড়া দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হতেই পারে না। সুতরাং এর অস্বীকার গোমরাহী। যারা এটাকে অস্বীকার করে তাদের তাওবা করা উচিত।

নবীজী (সা.) এর যুগে তাকলীদ-

তাকলীদের পরিচয় ও গুরুত্ব :

ইসলামী শরীয়তের মৌলিক চার দলীল সম্পর্কে জানার পর কথা হল কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের সামগ্রিক জীবনের সকল অঙ্গণের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান এই চার দলীলের মধ্যেই নিহিত। এটা নিছক কোনো দাবী নয়। পৃথিবীর সর্বযুগেই এর বাস্তবতা চাক্ষুষ করে আসছে। তবে এ দলীল চতুষ্টয় থেকে সরাসরি সমস্যার সমাধান খুঁজে নেওয়া বা পাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য নবীযুগ থেকেই নিয়ম চলে আসছে যে, উম্মতের মধ্যে কুরআন সুন্নাহ ও তা থেকে উৎসারিত ইলমে দ্বীন সম্পর্কে একটি দল পারদর্শিতা অর্জন করবেন আর অন্যরা কুরআন সুন্নাহর বিধানাবলী জানার জন্য তাদের দারস্থ হবেন এবং তাদের ব্যাখ্যা ও দিক নির্দেশনা অনুসারে কুরআন সুন্নাহ অবগত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবেন।

এভাবে কুরআন সুন্নাহর পারদর্শীদের শরানাপন্ন হয়ে তাদের নিকট থেকে শরয়ী বিধান এবং তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার প্রতি আস্থাশীল হয়ে তাদের বর্ণিত শরীয়তের বিধান মেনে নেয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় তাকলীদ বলা হয়।

এই পদ্ধতিতে বিধিবিধান মেনে চলা শরীয়তের শিক্ষার পাশাপাশি স্বভাবজাত বিষয়ও বটে। দ্বীন-দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে সবই এ নিয়মের অধীন। এটা এড়িয়ে চলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি পার্থিব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও মানুষকে বিজ্ঞজনের দারস্থ হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে কেউ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে না। বিজ্ঞজনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের দিক নির্দেশনা অনুসারে চলাকে নিজের জন্য নিরাপদ মনে করে। নিজের মনমত চলাকে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী জ্ঞান করা হয়। এটা ধন্যবাদযোগ্য একটি গুণ। আর বাস্তবেও তা সহজ ও নিরাপদ। যারা এই নিয়ম মেনে চলে তারা সফল হয় আর হঠকারীরা হয় ব্যর্থ মনোরথ। এটা কুরআনেরও নির্দেশনা যে, কোনো বিষয়ে জানা না থাকলে জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিবে। (সূরা আম্বিয়া-৭) ইসলাম তো সাধারণ দুনিয়াবী সফরেও একাকী বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রেই একজনকে আমীর বানিয়ে চলার নির্দেশ জারী করেছে। এতে অনুমান করা যায় আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের সুকঠিন ও সংবেদনশীল সফরে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে হলে খাইরুল কুরুনের ইলম-আমল, তাকওয়া-তাহারাতে সকলের আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বের- যাদের ইলম এখনও পর্যন্ত সুবিন্যস্ত আকারে বিদ্যমান- তাকলীদ বা অনুসরণ করা কতটা জরুরী। উপরন্তু বর্তমানের ধর্মহীনতার নায়ুক সময়ে তো এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। আহলে হাদীস বলে পরিচিত তাকলীদ অস্বীকারকারী বন্ধুদের শীর্ষস্থানীয় ইমাম মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী বলেন, "আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা যে, যারা অজ্ঞতাবশত: মুজতাহিদে মুতলাক ও মূল তাকলীদকে বর্জন করে শেষতক তারা ইসলামকেই বিদায় দিয়ে দেয়। (আসারুল হাদীস ড. খালিদ মাহমূদ ২/৩৮৫)

হক্কানী উলামায়ে কেরামের অভিজ্ঞতা হলো, বর্তমানে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার সহজ পথ হলো, চার ইমামের তাকলীদ থেকে বের হয়ে যাওয়া।

সংক্ষিপ্ত করে তাকলীদের পরিচয় ও গুরুত্ব তুলে ধরার পর এ পর্যায়ে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে তাকলীদ বিষয়ে কিছু আলোচনা পেশ করা হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম অন্য সাহাবার তাকলীদ করেছেন। এরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আবার এমনও দেখা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৌখিকভাবে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট করে কারো তাকলীদের স্বীকৃতি দিয়েছেন কিংবা কারও তাকলীদকে সমর্থন করেছেন। আবার কখনও তিনি গভর্ণর বানিয়ে একেক এলাকায় সাহাবায়ে কেরামকে পাঠিয়ে দিতেন। এবং ওই এলাকার লোকদেরকে ওই সাহাবীকে তাকলীদ করে দ্বীনের উপর চলতে বলতেন। স্বল্প পরিসরে এগুলোর উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

(ক) পরবর্তীদের জন্য সাহাবায়ে কেরামের তাকলীদের অনুমোদন :

☆ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার কয়েকজন সাহাবীকে জামা'আতে বিলম্বে আসতে দেখে বললেন, "তোমরা দ্রুত আসো এবং আমাকে দেখে দেখে অনুসরণ করো, তোমাদের পরবর্তী লোকেরা তোমাদের দেখে দেখে অনুসরণ করবে। (মুসলিম শরীফ ৪৩৮) বুখারী শরীফ

ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم

এই হাদীসে সাহাবা পরবর্তীদের জন্য সাহাবাদের তাকলীদের সুস্পষ্ট অনুমোদন রয়েছে।

☆ হাদীসে এসেছে আমার উম্মত তেয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি ছাড়া সকলেই জাহান্নামে যাবে। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই এক দলে কারা থাকবে। বললেন , ما انا عليه واصحابى অর্থাৎ যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শের উপর থাকবে। (জামে তিরমিযী ২৮৩২)

এখানেও সাহাবীদের তাকলীদকে পরবর্তীদের জন্য নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ) পরবর্তীদের জন্য নির্দিষ্ট সাহাবীদের তাকলীদের স্বীকৃতিঃ

☆ হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আমি জানিনা কতদিন তোমাদের মাঝে (জীবিত) থাকব। আমার পরে তোমরা দু'ব্যক্তির আবুবকর ও উমর (রা.) এর ইকতিদা (অনুসরণ) করবে। (জামে তিরমিযী-৩৬৬৩)

হাদীসে ইকতিদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইকতিদা অর্থ দ্বীনী বিষয়ে কারও অনুসরণ করা। এর নামই তাকলীদ।

☆ হযরত হুরাইস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য তা-ই পছন্দ করি, যা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তোমাদের জন্য পছন্দ করে। (মুস্তাদরাক ৫৩৯৪)

এই হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর পছন্দনীয় বিষয়গুলো সাহাবায়ে কেরামের জন্য অনুসরণীয় বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এটাই তাকলীদ।

☆ হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতানৈক্য লক্ষ্য করবে। তোমরা দ্বীনের নামে উদ্ভাসিত সকল বিষয় পরিহার করে চলবে। কেননা নি:সন্দেহে তা গোমরাহী। তোমাদের কেউ বিদআতী কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলে তার করণীয় হল আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আকড়ে ধরা। কাজেই মাড়ির দাঁত দ্বারা তা মজবুতভাবে আকড়ে রাখবে। (তিরমিযী শরীফ ২৬৭৬)

এই হাদীসে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে নিজের সুন্নাতের সাথে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। তাকলীদ তো এরই নাম।

(গ) নবীজীর (সা.) জীবদ্দশায় সাহাবীর তাকলীদের সমর্থন :

☆ হযরত সাহাল ইবনে মু'আয (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার স্বামী জিহাদে শরীক হয়েছেন। তিনি থাকা অবস্থায় আমি তার নামায ও অন্যান্য সকল আমল অনুসরণ করতাম। এখন তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আমাকে এমন কোনো আমল বাতলে দিন যা তার স্থলাভিষিক্ত হবে। (মুস্তাদরাক ২৩৯৭)

এই হাদীসে মহিলার জন্য ইলম ওয়ালা দ্বীনদার স্বামীর ইকতিদা ও অনুসরণকে সমর্থন করা হয়েছে। এরই নাম তাকলীদ।

(ঘ) গভর্নর হিসেবে এবং দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য সহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ :

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) ও হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)কে ইয়ামানের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের গভর্ণর করে প্রেরণ করেছিলেন। (বুখারী শরীফ ৪৩৪১) বলা বাহুল্য তারা সেখানকার জনগণকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। যা বুখারী শরীফের আরেকটি রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। (বুখারী শরীফ ১৩৯৫)

দেখা যাচ্ছে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল

ও হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) কে ইয়ামানবাসীর নিকট দ্বীনী বিষয়ে অনুসরণীয় হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এটাই তাকলীদ। কারণ প্রত্যেক ব্যপারে ইয়ামানবাসীদের জন্য মদীনায় এসে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে মাসআলা জেনে যাওয়া সুকঠিন ব্যাপার ছিল।

অনুরূপ বিভিন্ন কওমের প্রতিনিধি মদীনায় এসে দ্বীনী বিষয়ে অবগত হয়ে ফিরে গিয়ে কওমকে তা শিক্ষা দিতেন আর কওমও নির্দ্বিধায় বিনা বাক্য ব্যয়ে তাদের কথা মেনে নিতো। এর বহু দৃষ্টান্ত হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান।

প্রতীয়মান হল নিরাপদে দ্বীনের অনুসরণ করতে হলে তাকলীদে শাখসী বা নির্দিষ্ট মুজতাহিদ ও ইমামের তাকলীদ করা জরুরী। এটাকে হারাম বা শিরক বলা মারাত্মক পর্যায়ের গোমরাহী। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুসলিমাকে এ জাতীয় ফিতনা ফাসাদ থেকে নিরাপদ রাখুন।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে কিয়াস-ইজতিহাদ ও তাকলীদ :

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিজস্ব কিয়াস-ইজতিহাদ এবং তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামের কিয়াস-ইজতিহাদ ও তাকলীদ সংক্রান্ত আলোচনার পর আমরা সাহাবা যুগের কিয়াস-ইজতিহাদ ও তাকলীদ নিয়ে আলোচনা করব।

সাহাবাযুগে কিয়াস ও ইজতিহাদের নমূনা :

নমুনা -১

মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত নেই কিন্তু দাদা বেঁচে আছেন, এমতাবস্থায় মৃতব্যক্তির ভাই তাঁর দাদার বর্তমানে ওয়ারিশী সম্পত্তি লাভ করবেন কি না এ নিয়ে জটিলাতা দেখা দিল। কুরআন বা হাদীসে এর কোনো স্পষ্ট বিধান না থাকায় ফকীহ সাহাবীগণ থেকে এ ব্যাপারে দু'ধরনের মতামত পাওয়া গেল। একদল বললেন, মীরাস পাবে। আর অপর দল না পাওয়ার পক্ষে রায় দিলেন। পাওয়ার পক্ষে মত দিলেন হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) প্রমূখ সাহাবীগণ। সমস্যা নিরসনে হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত আলী (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) এর সাথে পরামর্শ করলেন।

হযরত আলী (রা.) তার মতের স্বপক্ষে কিয়াস পেশ করলেন, ইয়া আমীরাল মুমিনীন! ধরুন একটি বৃক্ষ থেকে একটি শাখা বের হল। তারপর শাখাটি থেকে আরও দুটি প্রশাখা উদগত হল। এক্ষেত্রে আপনার মতে প্রথম শাখাটির কে অধিক নিকটবর্তী? স্বয়ং বৃক্ষটি না তার থেকে উদগত প্রশাখা দুটি? হযরত উমর (রা.) বললেন, উভয়ে সমান অর্থাৎ স্বয়ং বৃক্ষ ও উদগত প্রশাখাদ্বয় উভয়ই প্রথম শাখাটির সমান নিকটবর্তী। হযরত আলী (রা.) বললেন, আমীরুল মুমিনীন! ভাই আর দাদার সম্পর্কও মৃতব্যক্তির সঙ্গে অনুরূপ। সুতরাং এক্ষেত্রে ভাই দাদার সঙ্গে মীরাস লাভ করবে।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! বলুন তো কোনো নদী থেকে একটি নালা বের হল, অতঃপর সেই নালা থেকে আরও দুটি উপনালা সৃষ্টি হল। এক্ষেত্রে নালাটির কে অধিক নিকটবর্তী। নদীটি না উপনালা দুটি? আমীরুল মুমিনীন বললেন, উভয়ই সমান নিকটবর্তী। এবার হযরত যায়েদ (রা.) বললেন, মাইয়েতের সঙ্গে ভাই আর দাদার অবস্থাও অনুরূপ। সাহাবীদ্বয়ের কিয়াস দর্শনে হযরত উমর (রা.) এর নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে ভাই দাদার সঙ্গে মীরাস লাভ করবে।

লক্ষ্যনীয় হল, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) দুজনেই আমীরুল মুমিনীনকে কিয়াসের মাধ্যমে জবাব দিলেন। আর আমীরুল মুমিনীনও তা মেনে নিলেন। শুধু তিনি কেন সকল সাহাবীই তাদের এ কিয়াস মেনে নিলেন। কেউ একথা বললেন না যে, শরীয়তের ব্যাপারে কিয়াস কেন সরাসরি কুরআন হাদীস পেশ করুন। কেননা তাদের জানা ছিল যে, সহীহ কিয়াস শরীয়তেরই একটি দলীল। (সূত্র: জামিউল মাসানিদ খাওয়ারেজমী কৃত ২/৩৩৮)

নমূনা ২.

মদ পানকারীকে কতটি বেত্রাঘাত করা হবে এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ ছিল। কারো বক্তব্য ছিল ৪০টি আর কারো মত ছিল ৮০টি। হযরত উমর (রা.) এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা.) এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, আমার মতে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হোক। কারণ যখন সে পান করে নেশাগ্রস্ত হয়। নেশা গ্রস্ত হলে প্রলাপ বকতে থাকে। আর প্রলাপ বকতে বকতে কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করে বসে। (আর অপবাদ আরোপের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত) তারপর হযরত উমর (রা.) মদপানকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করার সিদ্ধান্ত দিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক হাদীস নং ৯৯৫)

দেখা যাচ্ছে হযরত উমর (রা.) হযরত আলী (রা.) এর কিয়াসের ভিত্তিতে শরয়ী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করলেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী
জামিয়া রহমানিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উমরা ও হজ্ব কিভাবে আদায় করবেন

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান

(হজ্বের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কারো তাওফীক্ব হলে তা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে হজ্বের মাসাইল ও নিয়ম নীতি সম্পর্কে সাধারণ লোক তো বটেই এমনকি অনেক জানাশোনা লোকও বিভ্রান্তির শিকার হন। সে কারণে হজ্বের পূর্বে এবং হজ্বে থাকাকালীন হজ্বের বিধিবিধান সম্পর্কে সম্মক জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। সধারণের পক্ষে হজ্ব সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য কিতাব নির্বাচন করা মুশকিল। কারণ বাজারে নির্ভরযোগ্য অনেক বই যেমন পাওয়া যায় তেমনি হজ্ব সম্পর্কে অনির্ভরযোগ্য বইয়েরও অভাব নেই। বাংলাদেশের শীর্ষ আলেম ও মুরুব্বী ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর পূর্বে 'মক্কা মদীনার পাথেয়' নামে হজ্ব সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব রচনা করেন। যা সর্বস্তরে সমাদৃত। বইটি এ পর্যন্ত বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন ভার্শনে প্রকাশিত হয়ে আসছে। কেউ কেউ এটিকে সংক্ষিপ্ত করে হজ গাইড হিসেবে হাজীদের হাতে দিয়ে আসছিলেন। আমরাও বইটিকে সংক্ষিপ্ত করে হাজ্বীদের জন্য সহজ গাইড হিসেবে এখানে প্রকাশ করার প্রয়াস পাচ্ছি। আল-আবরার পরিবার)

ইহরাম :

প্রথমেই জেনে নিন আপনার গন্তব্য ঢাকা থেকে মক্কা শরীফ, নাকি মদীনা শরীফ। যদি মদীনা শরীফ হয়, তাহলে এখন ইহরাম বাঁধা নয়; যখন মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ যাবেন, তখন ইহরাম বাঁধতে হবে। বেশির ভাগ হজযাত্রী আগে মক্কায় যান। এ ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে বিমানে ওঠার আগে ইহরাম বাঁধা ভালো। কারণ, জেদ্দা পৌঁছার আগেই 'ইয়ালামলাম' মিকাত বা ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানটি পড়ে। বিমানে যদিও ইহরাম বাঁধার কথা বলা হয়, কিন্তু ওই সময় অনেকে ঘুমিয়ে থাকেন; আর বিমানে পোশাক পরিবর্তন করাটাও দৃষ্টিকটু।

মনে রাখবেন ইহরামের কাপড় পরিধান করলেই ইহরাম বাঁধা হয়ে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ত করে 'তালবিয়া' তথা "লাব্বাইক ....." পড়া না হয়। তাই ইহরামের কাপড় পরিধানের পর সতর্কতামূলক বিমান ছাড়ার পর নিয়ত করে তালবিয়া আরম্ভ করা ভাল। বিনা ইহরামে মিকাত পার হলে এ জন্য দম বা কাফফারা দিতে হবে। তদুপরি গোনাহ হবে।

হজ বা উমরাহ পালনকারী ব্যক্তির জন্য বিনা ইহরামে যে নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করা নিষিদ্ধ, তা-ই হলো মিকাত। বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘরের সম্মানার্থে প্রত্যেককে নিজ নিজ মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়।

মিকাত পাঁচটি :

১. যুল হুলায়ফা বা বীরে আলী : মদীনাবাসী এবং মদীনা হয়ে মক্কায় প্রবেশকারীদের মিকাত, ২. ইয়ালামলাম : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ থেকে জেদ্দা হয়ে মক্কা প্রবেশকারীদের মিকাত। ৩. আল-জুহফা : সিরিয়া, মিসর এবং সেদিক থেকে আগতদের মিকাত। ৪. কারনুল মানাজিল বা আসসায়েল আল-কাবির : নাজদ থেকে আগতদের জন্য মিকাত এবং ৫. যাতুল ইর্ক : ইরাক থেকে আগতদের জন্য মিকাত।

ঢাকা বিমানবন্দর

উড্ডয়নের সঠিক সময় অনুযায়ী বিমানবন্দরে পৌঁছুন। আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ব্যাগ বা সুটকেসে কোনো পচনশীল খাবার রাখবেন না। বিমানবন্দরে লাগেজে যে মাল দেবেন, তা ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে কি না, দেখে নেবেন। বিমানের কাউন্টারে মাল রেখে এর টোকেন দিলে তা যত্ন করে রাখবেন। কারণ, জেদ্দা বিমানবন্দরে ওই টোকেন দেখালে সেই ব্যাগ আপনাকে ফেরত দেবে। ইমিগ্রেশন, চেকিংয়ের পর নিজ মালপত্র সযত্নে রাখুন।

বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র, পিলগ্রিম পাস, বিমানের টিকিট, টিকা দেওয়ার কার্ড, অন্য

কাগজপত্র, টাকা, বিমানে পড়ার জন্য ধর্মীয় বই ইত্যাদি গলায় ঝোলানোর ব্যাগে যত্নে রাখুন।

সময়মতো বিমানে উঠে নির্ধারিত আসনে বসুন।

জেদ্দা বিমানবন্দর :

মোয়াল্লেমের গাড়ি আপনাকে জেদ্দা থেকে মক্কায় যে বাড়িতে থাকবেন, সেখানে নামিয়ে দেবে। মোয়াল্লেমের নম্বর (আরবিতে লেখা) কব্জি বেল্ট দেওয়া হবে, তা হাতে পরে নেবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র (যাতে পিলগ্রিম পাস নম্বর, নাম, ট্রাভেল এজেন্টের নাম ইত্যাদি থাকবে) গলায় ঝোলাবেন।

জেদ্দা থেকে মক্কায় পৌঁছাতে আনুমানিক দুই ঘণ্টা সময় লাগবে। যানবাহনের উঠানামার সময় ও চলার পথে বেশি বেশি তালবিয়া পড়ুন **(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাববাইকা লা-শরিকা লাকা লাববাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়ালমুলক লা-শরীকা লাক্।)**

মক্কায় পৌঁছে :

মক্কায় পৌঁছে আপনার থাকার জায়গায় মালপত্র রেখে ক্লান্ত হলে বিশ্রাম করুন। আর যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়, নামায আদায় করুন। বিশ্রাম শেষে উমরাহর নিয়ত করে থাকলে উমরাহ পালন করুন।

মসজিদুল হারামে (কা'বা শরিফ) অনেকগুলো প্রবেশপথ আছে; সব কটি দেখতে একই রকম। কিন্তু প্রতিটি প্রবেশপথে আরবি ও ইংরেজিতে ১, ২, ৩ নম্বার ও প্রবেশপথের নাম আছে, যেমন-বাদশা আবদুল আজিজ প্রবেশপথ। আপনি আগে থেকে ঠিক করবেন, কোন প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকবেন বা বের হবেন। আপনার সফরসঙ্গীকেও স্থান চিনিয়ে দিন। তিনি যদি হারিয়ে যান, তাহলে নির্দিষ্ট নম্বরের গেটের সামনে থাকবেন। এতে ভেতরে ভিড়ে হারিয়ে গেলেও নির্দিষ্ট স্থানে এসে সঙ্গীকে খুঁজে পাবেন।

কা'বা শরিফে স্যান্ডেল রাখার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবেন, নির্দিষ্ট স্থান তথা জুতা রাখার জায়গায় রাখুন। এখানে-সেখানে জুতা রাখলে পরে আর খুঁজে পাবেন না। প্রতিটি জুতা রাখার র‍্যাকেও নম্বর দেওয়া আছে। এই নম্বর মনে রাখুন।

উমরাহর নিয়মকানুন আগে জেনে নেবেন, যেমন-সাতবার তাওয়াফ করা, জমজমের পানি পান করা, নামায আদায় করা, সাঈ করা (সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো-যদিও মসৃণ পথ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) মাথা মুন্ডানো অথবা চুল ছোট করা-এসব কাজ ধারাবাহিকভাবে করা। ওয়াক্তীয়া নামাযের সময় হলে যতটুকু হয়েছে ওই সময় নামায পড়ে আবার বাকিটুকু শেষ করা।

কা'বা শরিফ :

হারাম শরীফে প্রবেশ করার সময় বিসমিল্লাহ ও দরুদ শরিফ পড়ার পর "আল্লাহুম্ মাফ তাহলি আব-ওয়া-বা রাহমাতিকা" পড়বেন। মসজিদুল হারামে কোনো নারীর পাশে অথবা তাঁর সরাসরি পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবেন না।

কোনো দরজার সামনে নামায পড়া ঠিক নয়, এতে পথচারীর কষ্ট হয়।

হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া সুন্নাত। তবে ভিড়ের কারণে না পারলে দূর থেকে চুমুর ইশারা করলেই চলবে। ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

উমরাহ ও হজ্ব পালন :

উমরাহ

হিল (হারামের সীমানার বাইরে মিকাতের ভেতরের স্থান) থেকে অথবা মিকাত থেকে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সাঈ করা এবং মাথার চুল ফেলে দেওয়া বা ছোট করাকে উমরাহ বলে।

হজ্ব তিন প্রকার-তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ।

হজ্জে তামাত্তু

হজ্বের মাসসমূহে (শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ্ব) উমরাহর নিয়তে ইহরাম করে, উমরাহ পালন করে, পরে হজ্বের নিয়ত করে হজ্ব পালন করাকে হজ্জে তামাত্তু বলে।

হজ্জে কিরান

হজ্বের মাসসমূহে একই সঙ্গে হজ্ব ও উমরাহ পালনের নিয়তে ইহরাম করে উমরাহ ও হজ্ব করাকে হজ্জে কিরান বলে।

হজ্জে ইফরাদ

শুধু হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে হজ্ব সম্পাদনকে হজ্জে ইফরাদ বলে।

তামাত্তু হজ্বের নিয়ম

১. উমরাহর ইহরাম (ফরজ)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সেরে গোসল বা অজু করে নিন।

মিকাত অতিক্রমের আগেই সেলাইবিহীন একটি সাদা কাপড় পরিধান করুন, আরেকটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ইহরামের নিয়তে দুই রাকাত নামায পড়ে নিন।

শুধু উমরাহর নিয়ত করে এক বা তিনবার তালবিয়া পড়ে নিন।

তালবিয়া হলো-"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান নিমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাক।"

২. উমরার তাওয়াফ (ফরজ)

অজুর সঙ্গে 'ইজতিবা'সহ তাওয়াফ করুন। ইহরামের চাদরকে ডান বগলের নিচের দিক থেকে পেঁচিয়ে এনে বাঁ কাঁধের ওপর রাখাকে 'ইজতিবা' বলে।

হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে তার বরাবর ডান পাশে দাঁড়ান (২০০৬ সাল থেকে মেঝেতে সাদা মার্বেল পাথর আর ডান পাশে সবুজ বাতি)। তারপর দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়ত করুন। তারপর ডানে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়াবেন, যেন হাজরে আসওয়াদ পুরোপুরি আপনার সামনে থাকে। এরপর দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়া লিল্লাহিল হামদ, ওয়াস সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসুলিল্লাহ" পড়ুন। পরে হাত ছেড়ে দিন এবং হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে হাতের তালুতে চুমু খেয়ে ডান দিকে চলতে থাকুন, যাতে পবিত্র কা'বাঘর পূর্ণ বাঁয়ে থাকে। পুরুষের জন্য প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাত। রমল অর্থ বীরের মতো বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ঘন ঘন কদম রেখে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা।

রুকনে ইয়ামানিকে সম্ভব হলে শুধু হাতে স্পর্শ করুন। রুকনে ইয়ামানিতে এলে **"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার, ওয়াআদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আযিযু ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল আলামিন"** বলুন। চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। অতঃপর হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এসে চক্কর পুরো করুন।

পুনরায় হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে হাতের তালুতে চুমু খেয়ে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুন। এভাবে সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করুন।

হাতে সাত দানার তসবি অথবা গণনাযন্ত্র রাখতে পারেন । তাহলে সাত চক্কর ভুল হবে না।

৩. তাওয়াফের দুই রাকা'আত নামায (ওয়াজিব)

মাকামে ইবরাহিমের পেছনে বা হারামের যেকোনো স্থানে তাওয়াফের নিয়তে (মাকরুহ সময় ছাড়া) দুই রাকা'আত নামায পড়ে দুআ করুন। মনে রাখবেন, এটা দোয়া কবুলের সময়।

৪. উমরাহর সাঈ (ওয়াজিব)

সাফা পাহাড়ের কিছুটা ওপরে উঠে (এখন আর পাহাড় নেই, মেঝেতে মার্বেল পাথর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) কা'বা শরিফের দিকে মুখ করে সাঈ-এর নিয়ত করে, দু'আর মতো করে হাত তুলে তিনবার তাকবির বলে দু'আ করুন। তারপর মারওয়ার দিকে রওনা হয়ে দুই সবুজ দাগের মধ্যে (এটা সেই জায়গা, যেখানে হজরত হাজেরা (রা.) পানির জন্য দৌড়েছিলেন) একটু দ্রুত পথ চলে মারওয়ায় পৌঁছালে এক চক্কর পূর্ণ হলো। মারওয়া পাহাড়ে উঠে কাবা শরিফের দিকে মুখ করে দু'আর মতো করে হাত তুলে তাকবির পড়ুন এবং আগের মতো চলে সেখান থেকে সাফায় পৌঁছালে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হলো এভাবে সপ্তম চক্করে মারওয়ায় গিয়ে সাঈ শেষ করে দোয়া করুন।

৫. হলক করা (ওয়াজিব)

পুরুষ হলে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদশের অনুসরণে সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করবেন, তবে মাথার চুল ছাঁটতেও পারেন। মহিলা হলে মাথার চুল এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটবেন।

এ পর্যন্ত উমরাহর কাজ শেষ।

হজ্বের ইহরাম না বাঁধা পর্যন্ত ইহরামের আগের মতো সব কাজ করতে পারবেন।

৬. হজ্বের ইহরাম (ফরজ)

হারাম শরিফ বা বাসা থেকে আগের নিয়মে শুধু হজ্বের নিয়তে ইহরাম বেঁধে ৮ জিলহজ্ব জোহরের আগেই মিনায় পৌঁছে যাবেন।

৭. মিনায় অবস্থান (সুন্নাত)

৮ জিলহজ্ব জোহর থেকে ৯ জিলহজ ফজরসহ মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় আদায় করুন এবং এ সময়ে মিনায় অবস্থান করুন।

৮. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান (ফরজ)

আরাফাতের ময়দানে অবস্থান হজ্বের অন্যতম ফরজ।

৯ জিলহজ্ব দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন। এদিন নিজ তাঁবুতে জোহর ও আসরের নামাজ স্ব স্ব সময়ে আলাদাভাবে আদায় করুন। মুকিম হলে চার রাকাত পূর্ণ পড়ুন। মসজিদে নামিরায় উভয় নামায জামা'আতে পড়লে একসঙ্গে আদায় করতে পারেন। যদি ইমাম মুসাফির হন আর মসজিদে নামিরা যদি আপনার কাছ থেকে দূরে থাকে, তাহলে নিজ স্থানে অবস্থান করবেন। মাগরিবের নামায না পড়ে মুজদালিফার দিকে রওনা হোন।

৯. মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব) রাত্রি যাপন (সুন্নাত)

আরাফায় সূর্যাস্তের পর মুজদালিফায় গিয়ে এশার সময়ে মাগরিব ও এশা এক আজান ও এক ইকামতে একসঙ্গে আদায় করুন।

এখানেই রাত যাপন করুন (এটি সুন্নাত) এবং ১০ জিলহজ ফজরের পর সূর্যোদয়ের আগে কিছু সময় মুজদালিফায় অবশ্যই অবস্থান করুন (এটি ওয়াজিব)। তবে দুর্বল (অপারগ) ও নারীদের বেলায় এটা অপরিহার্য নয়। রাতে ছোট ছোট ছোলার দানার মতো ৭০টি কঙ্কর সংগ্রহ করুন। মুজদালিফায় কঙ্কর খুব সহজেই পেয়ে যাবেন।

১০. কঙ্কর মারা (প্রথম দিন)

১০ জিলহজ্ব ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শুধু বড় জামারাকে (বড় শয়তান) সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)। এ সময়ে সম্ভব না হলে এ রাতের শেষ পর্যন্ত কঙ্কর মারতে পারেন। দুর্বল ও নারীদের জন্য রাতেই কঙ্কর মারা উত্তম ও নিরাপদ। কঙ্কর মারার স্থানে বাংলা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়; তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং মেনে চলুন।

১১. কোরবানি করা (ওয়াজিব)

১০ জিলহজ্ব কঙ্কর মারার পরই কেবল কোরবানি নিশ্চিত পন্থায় আদায় করুন।

কোরবানির পরেই কেবল রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শের অনুসরণে মাথা হলক করুন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছোটও করতে পারেন।

খেয়াল রাখবেন : কঙ্কর মারা, কোরবানি করা ও চুল কাটার মধ্যে ধারাবাহিকতা জরুরি ও ওয়াজিব; অন্যথায় দম বা কাফফারা দিয়ে হজ শুদ্ধ করতে হবে। বর্তমানে এই সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় হজ্জে ইফরাদ করা। যেখানে কোরবানি নেই।

হজ্বের পরে কেউ ওমরা পালন করতে চাইলে ১৩ তারিখ দিবাগত রাত থেকে উমরাহ পালন করতে পারবেন।

১২. তাওয়াফে জিয়ারত (ফরজ)

১২ জিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগেই তাওয়াফে জিয়ারত করে নিতে হবে। তা না হলে ১২ জিলহজের পরে তাওয়াফটি করে দম দিতে হবে। তবে নারীরা প্রাকৃতিক কারণে করতে না পারলে পবিত্র হওয়ার পরে করবেন।

১৩. কঙ্কর মারা (ওয়াজিব)

১১ ও ১২ জিলহজ্ব কঙ্কর মারা (ওয়াজিব)। ১১-১২ জিলহজ্ব দুপুর থেকে সময় আরম্ভ হয়। ভিড় এড়ানোর জন্য আসরের পর অথবা আপনার সুবিধাজনক সময়ে সাতটি করে কঙ্কর মারবেন-প্রথমে ছোট, মধ্যম, তারপর বড় শয়তানকে। ছোট জামারা থেকে শুরু করে বড় জামারায় শেষ করুন। সম্ভব না হলে শেষরাত পর্যন্ত মারতে পারেন। দুর্বল ও নারীদের জন্য রাতেই নিরাপদ।

১৪. মিনা ত্যাগ

১৩ জিলহজ্ব মিনায় না থাকতে চাইলে ১২ জিলহজ্ব সন্ধ্যার আগে অথবা সন্ধ্যার পর ভোর হওয়ার আগে মিনা ত্যাগ করুন। সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করতেই হবে-এটা ঠিক নয়। তবে সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করা উত্তম।

১৫. বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব)

বাংলাদেশ থেকে আগত হজযাত্রীদের হজ শেষে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হয় (ওয়াজিব)। তবে হজ শেষে যেকোনো নফল তাওয়াফই বিদায়ী তাওয়াফে পরিণত হয়ে যায়।

নারীদের মাসিকের কারণে বিদায়ী তাওয়াফ করতে না পারলে কোনো ক্ষতি নেই; দম বা কাফফারাও দিতে হয় না।

১৬. মিনায় অবস্থানরত দিনগুলোতে (১০, ১১ জিলহজ) মিনাতেই রাত যাপন করুন। আর ১২ তারিখ রাত যাপন করুন যদি ১৩ তারিখ রমি (কঙ্কর ছুড়ে মারা) শেষ করে ফিরতে চান (সুন্নাত)।

কিরান হজ্বের নিয়ম

১. ইহরাম বাঁধা (ফরজ)

জেদ্দা পৌঁছানোর আগে একই নিয়মে ইহরাম করার কাজ সমাপ্ত করুন। তবে তালবিয়ার আগেই হজ ও উমরাহ উভয়ের নিয়ত একসঙ্গে করুন।

২. উমরাহর তাওয়াফ (পূর্বে বর্ণিত) নিয়মে আদায় করুন (ওয়াজিব)।

৩. উমরাহর সাঈ করুন, তবে এরপর চুল ছাঁটবেন না; বরং ইহরামের সব বিধিবিধান মেনে চলুন (ওয়াজিব)।

৪. তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্নাত)।

৫. এরপর সাঈ করুন, যদি এ সময় সাঈ করতে না পারা যায় তাওয়াফে জিয়ারতের পরে করুন (ওয়াজিব)।

৬. আট জিলহজ্ব জোহর থেকে ৯ জিলহজ্ব ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনাতে পড়ুন। এ সময়ে মিনাতে অবস্থান করুন (সুন্নাত)।

৭. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন (ফরজ)।

৮. নয় জিলহজ সূর্যাস্তের পর থেকে মুজদালিফায় অবস্থান এবং মাগরিব ও এশা একসঙ্গে এশার সময়ে আদায় করুন (সুন্নাত)। তবে ১০ জিলহজ ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান করুন (ওয়াজিব)।

৯. ওপরে বর্ণিত নিয়ম ও সময় অনুসারে ১০ জিলহজ্ব কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।

১০. কোরবানি করুন (ওয়াজিব)।

১১. মাথার চুল মুণ্ডন করে নিন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন।

১২. তাওয়াফে জিয়ারত করুন (ফরজ) এবং সাঈ করে নিন, যদি তাওয়াফে কুদুমের পরে না করে থাকেন।

১৩. এগারো-বারো জিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)। ১৩ জিলহজ কঙ্কর মারা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ।

১৪. মিনায় থাকাকালীন মিনাতেই রাত যাপন করুন (সুন্নাত)।

১৫. মিকাতের বাইরে থেকে আগত হাজিরা বিদায়ী তাওয়াফ করুন (ওয়াজিব)।

ইফরাদ হজ্বের নিয়ম

১. শুধু হজ্বের নিয়তে (আগে বর্ণিত) ইহরাম বাঁধুন (ফরজ)।

২. মক্কা শরিফ পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্নাত)।

৩. সাঈ করুন (ওয়াজিব)। এ সময়ে সম্ভব না হলে সাঈ তাওয়াফে জিয়ারতের পরে করুন।

৪. মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও রাত যাপন করুন (সুন্নাত)।

৫. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন (ফরজ)।

৬. মুজদালিফায় অবস্থান করুন (সুন্নাত)। তবে ১০ জিলহজ্ব ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান ওয়াজিব।

৭. ১০ জিলহজে জামারাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।

৮. যেহেতু এ হজ্বে কোরবানি ওয়াজিব নয়, তাই কঙ্কর নিক্ষেপের পর মাথা হলক করে নিন; তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন (ওয়াজিব)।

৯. তাওয়াফে জিয়ারত করুন (ফরজ) এবং যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ না করে থাকেন, তাহলে সাঈ করে নিন (ওয়াজিব)।

১০. ১১-১২ জিলহজ্ব আগে বর্ণিত নিয়ম ও সময়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।

১১. বদলি হজকারী ইফরাদ হজ্ব করবেন।

ইহরাম, অন্যান্য পরামর্শ

ইহরাম সম্পর্কে জরুরি বিষয়

যাঁরা সরাসরি বাংলাদেশ থেকে মক্কা শরিফ যাবেন, তাঁরা বাড়িতে, হাজি ক্যাম্পে বা বিমানে ইহরাম করে নেবেন। বাড়িতে বা হাজি ক্যাম্পে ইহরাম করে নেওয়া সহজ। ইহরাম ছাড়া যেন মিকাত অতিক্রম না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

যাঁরা মদিনা শরিফ যাবেন, তাঁরা মদিনা শরিফ থেকে মক্কা যাওয়ার সময় ইহরাম করবেন। কোনো নারী প্রাকৃতিক কারণে অপবিত্র হয়ে থাকলে ইহরামের প্রয়োজন হলে অজু-গোসল করে নামাজ ব্যতীত লাব্বাইক পড়ে ইহরাম করে নেবেন। তাওয়াফ ছাড়া হজ্ব, উমরাহর সমস্ত কাজ নির্ধারিত নিয়মে আদায় করবেন।

তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয়

তাওয়াফের সময় অজু থাকা জরুরি। তবে সাঈ করার সময় অজু না থাকলেও সাঈ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া একটি সুন্নত। তা আদায় করতে গিয়ে লোকজনকে ধাক্কাধাক্কির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বড় গুনাহ। তাই তাওয়াফকালে বেশি ভিড় দেখলে ইশারায় চুমু দেবেন।

সাঈ করার সময় সাফা থেকে মারওয়া কিংবা মারওয়া থেকে সাফা প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন চক্কর। এভাবে সাতটি চক্কর সম্পূর্ণ হলে একটি সাঈ পূর্ণ হবে।

শেয়ার বাজার
শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা-১

মাওলানা মুফতী এনামুল হক কাসেমী

(কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকা এবং সেন্টার ফর ইসলামিক ইকনোমিক্স বাংলাদেশ বসুন্ধরাতে শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে এপর্যন্ত বহু ইস্তিফতা ও প্রশ্ন এসেছে। বিভিন্ন প্রশ্নের বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরও দেওয়া হয়েছে। মাসিক আল-আবরারে শেয়ার বাজারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আগত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আকারে উত্তর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেয়ার মার্কেটের লেনদেন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া হওয়ায় এসকল খণ্ড খণ্ড প্রশ্ন উত্তরে এর পরিপূর্ণ শরয়ী বিধান আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই শেয়ার বাজারের শরয়ী বিধানের উপর বিস্তারিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যাপারে সুপ্রিয়পাঠকদের পক্ষ থেকে অনুরোধ অব্যাহত ছিল। সময়ের আবেদন এবং পাঠকদের অনুরোধের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহের সার্বজনীন কল্যাণের দিক বিবেচনা করে "শেয়ার বাজার, শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা" শীর্ষক এই সুদীর্ঘ ধারাবাহিক লেখাটি প্রকাশের প্রয়াস পেলাম। এতে প্রথমে শেয়ার বাজার সম্পর্কে প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি ও পরিচিতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে এরপর এর শরয়ী বিধান সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ। মাসিক আল-আবরারের সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ- ***আল-আবরার পরিবার)***

শেয়ার কাকে বলে?

কোনো কোম্পানির মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে ভাগ করলে যে অংশ পাওয়া যায় তাকে শেয়ার বলা হয়। অথবা এরূপও বলা যায়, কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা অংশ বা অংশবিশেষকে শেয়ার বলে। যিনি এই শেয়ার কিনবেন তিনি কোম্পানির আংশিক মালিক হবেন এবং তাকে বলা হবে শেয়ার হোল্ডার। তবে পুঁজিবাজারের যে শেয়ার বেচাকেনা হয় তা একটি ইউনিট হিসেবে বিক্রি হয়। কয়েকটি ইউনিট মিলে একটি লট হয়। যেমন ১০০, ২৫০, ৫০০ ইত্যাদি। অর্থাৎ দশ টাকায় যদি এক ইউনিট কেনা যায় এবং ২৫০টিতে ওই কোম্পানির এক লট হয় তবে প্রতি লটের দাম হবে ২৫০০টাকা।

শেয়ার বাজার কি?

শেয়ার বাজার হলো এমন একটি বাজার যেখানে ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন দামে শেয়ার বেচাকেনা করে। শেয়ার ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে শেয়ার বেচাকেনা করে থাকে। এসব শেয়ার কোনো একটি স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত থাকে।

যিনি শেয়ারহোল্ডার তিনি চাইলে এখানে তার শেয়ার অন্য যে কারো কাছে বিক্রি করতে পারেন। আবার অন্য কোনো শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার ক্রয়ও করতে পারেন। পণ্য হিসেবে শেয়ার এখানে দৃশ্যমান কিছু নয়, মালিকানার অংশ অন্যের নিকট হস্তান্তর মাত্র। অনেকে শেয়ার বাজারকে পুঁজি বাজার বলে অভিহিত করে থাকেন। কারণ শেয়ার বাজারে পুঁজি সংগ্রহের আরো উপকরণ আছে তারও লেনদেন হয়। যেমন-ডিবেঞ্চার, সরকারি-বেসরকারি বন্ড, ডিরাইভেটিভস, ফিউচার ও অপশন ইত্যাদি। যেহেতু এখানে শেয়ারই অধিক বেচাকেনা হয় তাই তাকে শেয়ার বাজার হিসেবে অভিহিত করা হয়। (স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ১৭-১৮)

অর্থবাজার :

দুনিয়ার সকল দেশে লেনদেনের জন্য অর্থবাজার আছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বাজারে অর্থ সরবরাহের দেখাশোনা করা। ব্যাংকিং ব্যবস্থাও এর মধ্যে পড়ে। আমাদের দেশে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সরকারের পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে আমাদের অর্থ বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

শেয়ার বাজারের গুরুত্ব :

প্রত্যেক দেশে অর্থনৈতিক দৃঢ়তা অর্জনের জন্য শেয়ার বাজার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশের শেয়ার বাজার যতবেশি শক্তিশালী সে দেশের অর্থনীতি ততবেশি মজবুত। একটি দেশের অর্থনৈতিক সাবলম্বিতা অর্জন, বেকারত্ব দূরিকরণে উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নেই। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার যথাযথ ব্যবহার করার জন্য বৃহৎ আকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসকল কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপূল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা একজন মানুষের পক্ষে যোগান দেওয়া অসম্ভব। সরকারের পক্ষেও এধরনের কোম্পানি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা দুরুহ। আবার সেরূপ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সম্ভাবনাও ক্ষীন। তাই এধরনের কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে হলে জনসাধারণের উদ্বৃত্ত স্বল্প মূলধনকে একত্রিত করে বিপুল মূলধন সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ জনগণ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। কারণ কোম্পানি অর্জিত লভ্যাংশের একটি অংশ শেয়ার হোল্ডারের মাঝে বন্টন করলেও তাদের যখন নগদ টাকা প্রয়োজন হয়, তখন তা কোম্পানি থেকে উত্তোলন করতে পারে না।

কোম্পানির মূলধনের যোগান এবং

জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহার করার জন্য স্টক এক্সচেঞ্জ তথা শেয়ার বাজার অস্তিত্ব লাভ করেছে। যে সকল কোম্পানির মূলধনের প্রয়োজন তারা মূলধনকে কয়েকটি এককে ভাগ করে শেয়ার ছাড়ে। যারা এই শেয়ার ক্রয় করবে তারা কোম্পানির একটি অংশের মালিক হিসেবে বিবেচিত হবে। কোম্পানির লভ্যাংশে তারা অংশিদার হবে। আবার যখন কোনো কারণে শেয়ার হোল্ডার বা অংশিদারদের নগদ টাকার প্রয়োজন হবে তখন সে তার অংশ বা শেয়ার সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রি করে তার মূলধন উত্তোলন করে নিতে পারবে। সুতরাং শেয়ার বাজার এক দিকে যেমন কোম্পানির মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে অন্যদিকে জনগণের অর্থের সঞ্চয়, সঞ্চিত অর্থ উৎপাদন খাতে ব্যবহার এবং চাহিবা মাত্র নগদ অর্থে রূপান্তর করতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় শেয়ার কমদামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হচেছ। ব্যাংকের মাধ্যমে যদিও কোম্পানির মূলধন গঠন এবং জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থের ব্যবহার করা যায় কিন্তু তাতে জনগণ চাহিবা মাত্র তাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারে না। অনেক সময় ব্যাংকের পুরো টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কোম্পানিও অনেক সময় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে চায় না। কারণ কোম্পানির লাভ হোক আর না হোক ব্যাংককে তার ঋণের বিপরীতে নির্ধারিত হারে সুদ দিতে হয় এবং মেয়াদ শেষে তার অর্থ পরিশোধের চাপে থাকতে হয়। সাধারণত তখন জনগণও কোম্পানির উৎপাদনে অংশিদার হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু শেয়ার বাজারের মাধ্যমে কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করলে ব্যাংকের উল্লেখিত ঝামেলাসমূহ বরদাশত করতে হয় না কোম্পানিকে। বরং কোম্পানি বিলুপ্ত হলেই কেবল জনগণের মূলধন ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকে। তবে এর আগেও কোম্পানি চাইলে মূলধন ফেরৎ দিতে পারে কিন্তু বাধ্য নয়। এসকল কারণে একটি দেশের অর্থনীতির ভীত শক্তিশালী করার জন্য শেয়ার বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শেয়ার মালিকদের অধিকার :

শেয়ারে বিনিয়োগকারীদের যে অধিকার রয়েছে একই অধিকার শেয়ার মালিকদেরও রয়েছে। এছাড়া ১৯৯৪সালে বর্ণিত কোম্পানি আইনে নিম্ন বর্ণিত অধিকারগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১. সভার বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার অধিকারঃ

একজন শেয়ার হোল্ডারের প্রথম যে অধিকার রয়েছে তা হলো প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের আগেই ওই সভার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া।

২। সভায় উপস্থিত হওয়া ও ভোট দানের অধিকার :

প্রত্যেক শেয়ার মালিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়া এবং সভায় ভোটদানের প্রয়োজন হলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

৩। বার্ষিক বিবরণী পাওয়ার অধিকার :

শেয়ার মালিকদের বার্ষিক বিবরণি রিপোর্ট পাওয়ার অধিকার আছে। বার্ষিক বিবরণির মধ্যে শেষ সময়ের লাভ ক্ষতির হিসাব, ব্যালেন্স শীট, তহবিল প্রবাহ বিবরণী এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত হয়। কোনো কারণে বছর শেষ হওয়ার নয় মাসের মধ্যে যদি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হয় তবে ওই সময়ের মধ্যে বার্ষিক বিবরণী পাওয়ার অধিকার শেয়ার মালিক সংরক্ষণ করেন।

৪। লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকার :

শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। পরিচালকমণ্ডলি কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীণ লভ্যাংশ ঘোষণার এবং সাধারণ সভা কর্তৃক চুড়ান্ত লভ্যাংশ বা বোনাস শেয়ার প্রদানের বিষয়ে অনুমোদন ৬০ দিনের মধ্যে লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকার আছে।

৫। পরিচালক নির্বাচনের অধিকার :

সাধারণ শেয়ার মালিকরা বার্ষিক সাধারণ সভার পরিচালক নির্বাচনের বিধান থাকা সাপেক্ষে পরিচালক নিয়োগ করতে পারেন।

৬। কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার :

প্রত্যেক সাধারণ শেয়ারের মালিক কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। তবে এক্ষেত্রে পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাসূচক শেয়ার তার মালিকানায় থাকতে হবে এবং ওই সংখ্যক ভোট পেতে হবে।

৭। রাইট শেয়ার পাওয়ার অধিকার :

অনেক সময় কোম্পানি মূলধন বৃদ্ধির জন্য রাইট শেয়ার ইস্যু করে। এতে প্রত্যেক শেয়ার মালিক তার শেয়ারের আনুপাতিক হারে রাইট পাওয়ার অধিকার রাখে। তবে শেয়ার মালিক ইচ্ছা করলে রাইট শেয়ার ক্রয় নাও করতে পারে বা অন্য কারো অনুকুলে অধিকার হস্তান্তর করতে পারে।

৮। অভিযোগ করার অধিকার :

একজন শেয়ার মালিক যদি অনুভব করেন যে তার সাধারণ অধিকার লঙ্ঘিত হচেছ তবে তিনি অভিযোগের বিষয়টি অবহিত করার এবং প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রাখেন। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুকুলে তাকে অভিযোগ করতে হবে। (স্টক একচেঞ্জ ও শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ৩৬)

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি :

সাধারণত কোনো ব্যক্তি সরাসরি শেয়ার কিনতে পারে না এবং বেচতেও পারে না। শেয়ার কেনাবেচা করার জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা একটি মধ্যস্থতার দারস্থ হতে হয়। সে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হলো ব্রোকার হাউজ। সে ক্রেতার অর্ডারের ভিত্তিতে শেয়ার ক্রয় এবং বিক্রয় করে থাকে। যারা শেয়ার বেচাকেনা করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য প্রথমে দু'টি একাউন্ট খুলতে হয়। একটি ব্যাংকে সেভিং একাউন্ট অপরটি হলো

যে ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে লেনদেন করবে তাতে একটি বিউ একাউন্ট। এ একান্টকে বেনিফিসিয়ারী অনার একাউন্ট বলা হয়। এ বিও একাউন্ট খোলার পর একজন বিনিয়োগকারী প্রাইমারি, সেকেন্ডারি উভয় মার্কেটে লেনদেন করতে পারে। যে প্রতিষ্ঠানে একাউন্ট খোলা হবে লেনদেন তাদের মাধ্যমেই করতে হয়। লেনদেনকৃত অর্থের কিছু কমিশন তারা পাবে পরিচালনার খরচ হিসেবে। সাধারণত তিন ও পাঁচ দিনের মধ্যে বিও একাউন্ট নাম্বার এবং গ্রাহক পরিচিতি প্রদান করা হয়। আর তখন থেকেই শেয়ার কেনাবেচা করতে পারে। লেনদেনকৃত শেয়ারের হিসাব রাখার জন্য এ একাউন্ট খোলা হয় এবং এটা শেয়ারের বিস্তারিত খতিয়ান। এক ব্যক্তি একটি একাউন্ট খুলতে পারে। কেউ চাইলে অন্যের সাথে আরেকটি বিও একাউন্ট যৌথভাবে খুলতে পারে।

বিনিয়োগকারী ব্রোকার হাউজের গ্রাহক হওয়ার পর কেনাবেচার অর্ডার দিতে পারে। যদি বিনিয়োগকারী শেয়ার ক্রয় করতে চায় তাহলে বিনিয়োগকারীর কাস্টমার একাউন্টে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা থাকার সাপেক্ষে শেয়ার কেনার জন্য স্লিপে ক্রয়ের অর্ডার দিতে পারে। শেয়ার কেনা বেচার শেষে অবশ্যই বাই সেল অর্ডার এবং সিডিবিএল বিক্রির ক্ষেত্রে পে ইন ট্রান্সফার ফরম পুরণ করতে হয়। যে সকল কোম্পানি মাত্র আইপিওতে আসছে অর্থাৎ নতুন শেয়ার ছাড়ছে তাদের শেয়ার কিনতে হলে প্রথমে একটি ফরম পুরণ করে শেয়ারের মূল্যসহ জমা দিতে হয়। আবেদনকারীর সংখ্যা যদি শেয়ারের চেয়ে অধিক হয় তাহলে লটারির মাধ্যমে শেয়ার প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন কোনো কোম্পানির একলক্ষ শেয়ার ছাড়লো, যার অভিহিত মূল্য ১০ টাকা, ১০০টি করে প্রতি লট নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট লট হলো একহাজার কিন্তু শেয়ারের জন্য আবেদন করেছে বিশহাজার মানুষ। এক্ষেত্রে কোম্পানি লটারির মাধ্যমে বাছাই করবে। লটারিতে যাদের নাম আসবে তারা শেয়ার পাবে। আর যাদের নাম আসবে না তারা অর্থ ফেরৎ পাবে। এটা হলো প্রাইমারি মার্কেটের অবস্থা। সেকেন্ডারি মার্কেটে শেয়ার কিনতে হলে ক্রয়ের জন্য আবেদন করতে হয় না। বরং তাৎক্ষনিক শেয়ার ক্রয় এবং বিক্রয় করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে শেয়ার ক্রয়ের পর তিন কার্যদিবসের পূর্বে বিক্রি করা আইনত নিষিদ্ধ।

শেয়ার বাজারের প্রকার ঃ

সাধারণত বিনিয়োগকারীরা দুধরনের বাজার থেকে শেয়ার কিনতে পারে। দুধরনের বাজার বলতে প্রাথমিক বাজার (Primery market) এবং দ্বিতীয় বাজার বা মাধ্যমিক বাজার (Secondery market) প্রাইমারি বাজার মানে হলো সদ্য নতুন ইস্যুর বাজার অর্থাৎ কোম্পানি যে বাজারে প্রথমবারের মত শেয়ার ছাড়ে ইস্যুকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত দরে বিনিয়োগকারীদের ক্রয় করার জন্য, তাকে প্রাইমারি বাজার বলে। একে আইপিও বা initial pablic offer বাজারও বলে। যেসব সিকিউরিটি আগে পুঁজি বাজারে কেনাবেচা হয়নি সেসব সিকিউরিটি প্রাথমিক বাজারে ক্রয় করতে হয়।

একবার শেয়ার ক্রয় করার পর ওই শেয়ারগুলো যখন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পুণঃরায় কেনাবেচা হয় তখন তাকে দ্বিতীয় বা সেকেন্ডারি মার্কেট বলে। স্টক এক্সচেঞ্জে যে শেয়ার কেনাবেচা হয় তা সেকেন্ডারি মার্কেটের কেনাবেচা। শেয়ার মূল্যের যে সূচকের কথা প্রতিনিয়ত বিনিয়োগকারীরা শুনে থাকে সেটা সেকেন্ডারি মার্কেটের সূচক। এ সূচক বাড়ার আগে যারা বিনিয়োগ করে তারা লাভবান হয়, আর কমলে বাজার অর্থ হারিয়েছে বলা হয়।

আইপিও (IPO) কি?

আইপিওর অর্থ ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং। যখন কোনো কোম্পানি জনগণের কাছে মালিকানার অংশবিশেষ বিক্রি করার জন্য প্রস্তাব দেয় তাকে আইপিও বলে। বিনিয়োগকারীদের অর্থ বাড়ানোর জন্য আইপিও একটি আন্তর্জাতিক পদ্ধতি। তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশের আইপিওতে ঝুঁকি কম। ২০০৭ সালে ১৪ টি, ২০০৮ সালে ১২টি এবং ২০০৯ সালে ১৮টি কোম্পানি আইপিওতে আসে। কি ধরনের কোম্পানি আইপিওতে আসতে পারে তার একটি নীতিমালা আছে। এই নীতিমালাকে আইপিও রুল বলে। যে সকল কোম্পানির মালিকের সংখ্যা ২৫০ জনের কম নয় এবং বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে কমপক্ষে তিন বছর লোকসান দেয়নি সেই সকল কোম্পানির উদ্যোক্তা পরিচালক ইচ্ছা করলে আইপিওতে আসতে পারে। তাকে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছে অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি নিতে হলে কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রাপ্ত ইস্যু ম্যানেজার নিয়োগ দিতে হবে।

আইপিও রুলের শর্তানুযায়ী কমিশনের নিকট নিম্ন লিখিত তথ্য, দলীল, দস্তাবেজ জমা দিতে হবে। আবেদনের সঙ্গে খসড়া প্রসপেক্টাস বিনিয়োগকারীদের অবগতির জন্য কমপক্ষে একটি ইংরেজি এবং আরেকটি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। আইপিওর শর্ত ভঙ্গ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রসপেক্টাসে যেসব বিষয় উল্লেখ করতে হয় তা নিম্নরূপ।

১. কোম্পানির ব্যবসার ধরণ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

২. কোম্পানির সম্পদের বিবরণ, পরিমাণ ও মূল্য।

৩. আইপিও থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোন কোন খাতে ব্যবহার করা হবে তার বর্ণনা।

৪. কোম্পানির পরিচালকদের নাম, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং এদের পরিচালনাধীন কোম্পানির নামের তালিকা।

৫. অডিটরস রিপোর্ট।
৬. বিগত এক বছর অডিটেড আর্থিক হিসাব নিকাশ।
৭. স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্তির ঘোষণা।
৮. আইপিও রুলস ২০০৬ অনুসারে অন্যান্য আনুসাঙ্গিক হিসাবপত্র।

শেয়ারের মুনাফা বন্টন পদ্ধতি :

প্রতিটি কোম্পানি বছরের একটি সময়ে তাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব করে। তারপর কোম্পানির অর্জিত মোনাফার একটি অংশ রিজার্ভ ফান্ডে রেখে অবশিষ্ট অংশ যাকে ডিভিডেন্ট বলে তা শেয়ারহোল্ডারের মাঝে বন্টন করে। ডিভিডেন্ট বন্টনের দুটি পদ্ধতি। একটি হলো নগদ টাকা হিসেবে শেয়ার হোল্ডারদের প্রদান করলো। নগদ টাকা না দিয়ে এই লভ্যাংশের উপর দ্বিতীয়বার শেয়ার ছাড়লো। এধরনের শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বা অধিবৃত্তি শেয়ার বলে। যেমন কোনো কোম্পানি যদি ৩৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করে তাহলে সে আইপিওতে প্রিমিয়াম ব্যতীত শেয়ারের যে মূল্য আছে অর্থাৎ ফেইসভ্যালুর মূল্যের উপর ৩৫ শতাংশ নগদ টাকা পাবে। এক্ষেত্রে মার্কেট থেকে শেয়ারটি কত দামে কেনা হলো সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। যেমন কোনো ব্যক্তি ১০ টাকা ফেইসভ্যালুর শেয়ার মার্কেট থেকে ২৫০/৫০০ টাকায় কিনলো এবং কোম্পানি ৩৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করলো, তাহলে সে ৩.৫ টাকা হারে লভ্যাংশ পাবে। অন্যদিকে ৩৫ শতাংশ লভ্যাংশের বিপরীতে যদি বোনাস শেয়ার ছাড়ে তাহলে ক্রয়কৃত প্রতি ১০০ শেয়ারের বিপরীতে ৩৫টি শেয়ার পাবে। কারো কাছে ১০০টি শেয়ার থাকলে তা ১৩৫ এ উন্নীত হবে এবং সে চাইলে এই শেয়ার বাজারে বিক্রি করতে পারবে।

বোনাস শেয়ার চালু করার কারণে কোম্পানির পুঁজি বৃদ্ধি পায়। সাধারণত কোম্পানির ক্যাশ পজিশন দুর্বল হলে অতিরিক্ত শেয়ার ইস্যু করে। তবে এর জন্য অনুমোদিত মূলধনে অবকাশ থাকতে হবে। যেমন ৮০ মিলিয়ন মূলধনের কোম্পানি অনুমতি পেয়েছে এর মধ্যে ৬০ মিলিয়ন পর্যন্ত শেয়ার চালু করা হয়েছে ২০ মিলিয়ন এখনও বাকি আছে। তাহলে ২০ মিলিয়নের বোনাস শেয়ার ইস্যু করতে পারবে। যদি মূলধনে অবকাশ না থাকে তাহলে দ্বিতীয়বার দরখাস্ত দিয়ে অনুমতি নিতে হবে। বোনাস শেয়ার চালু করার জন্য আরেকটি আবশ্যকীয় বিষয় হলো কোম্পানির শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু (Market Value) লিখিত মূল্যের (Face Value) চেয়ে কম হতে পারবে না। মার্কেট ভ্যালু কম হলে শেয়ার হোল্ডারদের ক্ষতি হবে। যেমন ১০ টাকা মূল্যের শেয়ার ৯টাকা হলে শেয়ার হোল্ডাররা ৯টাকা পাবে, তাই সে ১টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হল। (স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ১৮৫, ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা পৃ: ৫৫,৫৬)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখা আহ্বান **লেখা আহ্বান** **লেখা আহ্বান**

আল-আবরার পরিবার অত্যন্ত আনন্দের সাথে আহ্বান জানাচ্ছে, সমাজের বিজ্ঞ, দক্ষ, সহনশীল ও মননশীল ইসলামিক স্কলার, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের মূল্যবান তাত্ত্বিক লেখনী ও কবিতার, যা পূরণ করবে সমাজের ইসলামপ্রিয় সর্বসাধারণের ধর্মীয় চাহিদা ও মেটাবে তাদের পিপাসা।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

১। লেখককে অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে।
২। লেখকের পূর্ণ ঠিকানা পেশ করতে হবে।
৩। লেখা বিষয়ভিত্তিক, যুগোপযোগী, গবেষণালব্ধ ও তথ্যবহুল হতে হবে।
৪। কোনো সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও বিতর্কিত লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না।
৫। প্রতিটি বিষয়ের রেফারেন্স সবিস্তারে উল্লেখ থাকতে হবে।
৬। লেখা এ-৪ সাইজের কাগজে এক পিঠে কম্পোজ করে অথবা সুন্দর হস্তাক্ষরে স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে।
৭। সম্পাদনা দফতর লেখা নির্বাচন, কাটছাঁট করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার রাখবে।
৮। অনির্বাচিত লেখা ফেরত পাঠানো হবে না।
৯। লেখা প্রতি ইংরেজি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সম্পাদনা দফতরে পৌঁছাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রকাশনা দফতর : মাসিক আল-আবরার
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ,
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বাড্ডা, ঢাকা।
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com

কোয়ান্টাম মেথড-৬

বেদ-বাইবেলের প্রচার ?

মুফতী শরীফুল আ'জম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত সকল নবী রাসূল ও সকল আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করা ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিশ্বাসের অন্যতম। নিজ নিজ যামানায় তাঁরা সকলেই অনুসরণীয় ছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরা যে সকল বিধিবিধান প্রচার করেছেন, তা পালন ওই যুগে আবশ্যক ছিল। সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন এসে পূর্বের সকল কিতাবসমূহকে রহিত করে দিয়েছে। সর্ব শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ হয় এই কুরআনুল কারীম। কেয়ামত অবদি তাঁর শরীয়ত পালন গোটা মানব জাতির সুখ-শান্তি ও সফলতার জন্য আবশ্যক। প্রতিটি নবজাতক তাঁরই উম্মত ও কুরআনের অনুসারী হিসেবে ভূমিষ্ট হয়। যদিও মাতা পিতা পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খল ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে সে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান বা ইহুদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

একজন মুসলমান পূর্বের সকল নবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থসমূহের স্বীকৃতি প্রদানকে নিজের ঈমানের অংশ মনে করে থাকে। মুসলমানদের এই ধর্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে কুরআন পাকের এই নির্দেশনা। "তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে তৎসমুদয়ের প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। (সূরা আল-বাকারা- ১৩৬)

পক্ষান্তরে ইহুদী-খ্রীস্টানগণ নিজেদের ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করতে চায় না। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) ও সর্বশেষ ঐশী কিতাব পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে চায় না। যা তাদের হঠকারীতা ও হীনমন্যতার পরিচায়ক।

অথচ শেষ নবীর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদী-খ্রীস্টানগণ অধির আগ্রহের সাথে তাঁর পথপানে তাকিয়ে ছিল। শেষ নবীর আগমণ সংক্রান্ত তাওরাত- ইঞ্জীলের ভাবিষ্যদ্বাণী পড়েই মূলত তাদের মধ্যে এই ব্যকুলতা সৃষ্টি হয়েছিল। ইহুদীরা কাফের পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে এই প্রার্থনা করতো "হে আল্লাহ শেষ জামানার নবী ও তার উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হবে তার উসিলায় কাফেরদের উপর আমাদের বিজিত করো।" আর যখন শেষ জামানার নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) এর আগমণ ঘটল এবং তারা সকল লক্ষণ দেখে তাঁকে চিনতে পারল তখন শুধু মাত্র স্বগোত্রীয় না হওয়ায় তাদের মনপূত হলো না এবং অস্বীকার করে বসল। ফলে তারা অভিশপ্ত হলো।

পবিত্র কুরআনে তাদের এমন অপেক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

"এবং যখন তাদের নিকট আল্লাহর তরফ হতে তাদের ধর্মগ্রন্থ (তাওরাত) এর সমর্থনকারী কিতাব (কুরআন) পৌঁছল অথচ ইতঃপূর্বে তারা কাফেরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করত। কিন্তু যখন তাদের চেনা জানা বস্তু অর্থাৎ কুরআন তাদের নিকট পৌঁছল তখন তা অমান্য করে বসল। সুতরাং অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।" (সূরা আল-বাকারা ৮৯)

তারা শুধু ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং সত্য ধর্ম ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদীলবি ও খ্রীস্টান মিশনারী বিভিন্ন ছলে-বলে, কলাকৌশলে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজের এলিট শ্রেণী থেকে একেবারে মঙ্গাপীড়িত মানুষ পর্যন্ত তাদের টার্গেটে পরিণত হচেছ। মুসলমানদের খ্রীস্টান ধর্মে দিক্ষিত করাই যেন তাদের কাছে মহা পূণ্যের কাজ। পবিত্র কুরআনে তাদের এই মনোভাবকে এভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে–

"ইহুদী ও খ্রীস্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।" (সূরা আল-বাকারা ১২০)

তাদের এই অপকর্মে নতুন সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড। খ্রীস্টান মিশনারীদের যে কাজ করতে অনেক বেগ পেতে হতো, কোয়ান্টাম তা অনায়াশেই করে যাচ্ছে। মুসলমানদের হাতে হাতে বাইবেলের বাণী পৌঁছানো সহজ হয়েছে কোয়ান্টামের আশির্বাদে। কোয়ান্টাম

কনিকা গ্রন্থের ২৮৫-২৯২পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে বাইবেলের মর্মবাণী। কোয়ান্টামের দাবী হলো তাদের কর্মকাণ্ডে ইসলাম বিরোধী কোনো বিষয় নেই। অথচ খোদ বাইবেলের প্রচার একটি ইসলাম বিরোধী কাজ। ইসলামের দৃষ্টিতে বাইবেল চর্চা এর প্রচার প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তাওরাত ইঞ্জিল প্রকৃত পক্ষে বর্তমানের এই বাইবেল নয়। এ মহাসত্যকে অনুধাবনের জন্য ইতিহাস ও কুরআন হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

☆ বাইবেল (Bible) শব্দটি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষা হতে নেওয়া হয়েছে। যা মূলত গ্রীক ভাষা থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ গ্রন্থসমূহের সংকলন। ল্যাটিন ভাষার শব্দটি একবচন স্ত্রী লিঙ্গ। এভাবে শব্দটি ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে গ্রীকভাষা হতে ইংরেজী ভাষায় প্রবেশ করেছে। এটা ঐশী বাণী সমূহের সংকলন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৩ আগস্ট ১৯৮৭)

বাইবেলের গ্রন্থসমূহ প্রথমত: দুভাগে বিভক্ত। (ক) ওই সমস্ত গ্রন্থ যা খ্রীস্টানদের মতে হযরত ঈসা আ. এর পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তাদের কাছে এসেছে। (খ) ওই সমস্ত গ্রন্থ যা হযরত ঈসা (আ.) এর পর এলহাম তথা ঐশী অনুপ্রেরণার মাধ্যমে লেখা হয়েছে। প্রথম প্রকারকে পুরাতন নিয়ম (old testament) বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারকে নব বিধান (New testament) বলা হয়। উভয়ের সমন্বয় হচেছ বাইবেল। old testament পুরতান নিয়মের মাঝে ৪৭টি গ্রন্থ রয়েছে। যার প্রথম পাঁচটির সমষ্টির (পঞ্চগ্রন্থ) নাম হচেছ 'তাওরাত'। New testament নব বিধানের মাঝে স্থান পেয়েছে ২৭টি গ্রন্থ। তন্মধ্যে প্রধান চারটি গ্রন্থ হযরত ঈসা আ. এর চার জন শিষ্য মথি, মার্ক, লুক ও যোহন কর্তৃক রচিত। এই চারটি গ্রন্থকে ইঞ্জিল চতুষ্টয় বলা হয়। খ্রীস্টানদের নিকট ইঞ্জিল শব্দটি এই গ্রন্থ চারটিতে সীমাবদ্ধ। আবার কখনও রূপক অর্থে নিউ টেস্টামেন্টের সকল গ্রন্থকে ইঞ্জিল বলা হয়। (বাইবেল সে কুরআন তক ১/৩০৫-৩১৮)

হযরত ঈসা আ. এবং তাঁর সহচরদের বাইবেল ছিল আদী পুস্তক ওল্ড টেস্টামেন্ট। যতদূর জানা যায় হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর সহচরগণ তাদের জীবদ্দশায় আদী পুস্তককে নিজেদের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। এ জন্য হযরত ঈসা আ. এর পর ২০ বছর পর্যন্ত কেউ নতুন গ্রন্থ সংকলনের প্রয়োজন অনুভব করেননি। (ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৩)

তাওরাত ও ইঞ্জিলের মাঝে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাওরাতের সম্পূরক হিসেবে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

"স্মরণ কর যখন মরিয়ম তনয় ঈসা আ. বলল হে বনি ইসরাঈল আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী।" (সূরা আসসাফ ৬)

এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা আ. এর শরীয়ত যদিও স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু তার অধিকাংশ বিধিবিধান মূসা আ. এর শরীয়ত ও তাওরাতের অনুরূপ। স্বল্প সংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র। (মা'আরেফুল কুরআন)

তাওরাতের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন :

তাওরাত ও ইহুদীদের অন্যান্য পবিত্র পদার্থসমূহ বাইতুল মুকাদ্দাসে রক্ষিত ছিল। খ্রীস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে বাবেলিয়ান রাজ বুখতে নসর কর্তৃক ইহুদী রাজ্য আক্রমণ হওয়ার ফলে তাওরাত ইত্যাদিসহ বাইতুল মুকাদ্দাস অগ্নিতে ভস্মীভূত হয় এবং সমস্ত ইহুদী নরনারী নিহত ও বন্দি হয়। এই ধ্বংসলীলার ফলে তাওরাত ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর খ্রীস্টপূর্ব ৫৩২ অব্দে পারস্য রাজের সাহায্যে বাইতুল মুকাদ্দাস পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে ইসরা আজরা নামক এক ব্যক্তি কতগুলো কাগজ পত্র ইহুদীদের সামনে হাজির করে বলে এগুলোই হযরত মূসা আ. এর তাওরাত। এভাবে প্রথম পঞ্চগ্রন্থ সংকলিত হয়। নাহিমিয়া নামক এক ব্যক্তি আরোকতগুলো পুস্তক সংকলন করে তার সাথে সংযোজন করে দেয়।

খ্রীস্টপূর্ব ১৬৮ অব্দে ইন্তাকিয়ার রাজ এন্টিনিউস পূনরায় ইহুদীদের পরাভূত করে তাদের সকল ধর্মগ্রন্থগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলে এবং কঠোর আদেশ জারি করে যে, ইহুদী ধর্মগ্রন্থ কেউ মুখে মুখেও পাঠ করতে পারবে না। এর বহুদিন পর মাকাবী নামক দেশহিতৈষী এক ব্যক্তি এন্টিনিউসকে পরাজিত করে কতগুলো পুস্তিকা ইহুদীগণের সামনে উপস্থিত করে বলে এগুলোই ইসরা ও নাহিমিয়ার তাওরাত। সাথে আরো কিছু অংশ যোগ করে দেয়। ৭০ খ্রীস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর রোমান রাজ টাইটিউস জেরুজালেম অধিকার করে বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে ফেলে এবং বিজয় চিহ্ন স্বরূপ ইহুদীদের সকল ধর্মগ্রন্থ রোমীয় রাজধানীতে নিয়ে যায়। এভাবে ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থগুলো পুন: পুন: বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হওয়ার ফলে সে যুগের ইহুদী পণ্ডিতগণ নিজেদের খেয়াল ও আবশ্যকতা অনুযায়ী পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে সেগুলোকে ধর্মগ্রন্থ বলে প্রচার করতে থাকে। আর প্রকৃত তাওরাত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বাইবেলের প্রথম অংশ ওল্ড টেস্টামেন্ট এ স্থান পাওয়া তাওরাতের এটাই প্রকৃত অবস্থা।

ইঞ্জীলের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন :

নিউ টেস্টামেন্ট বা ইঞ্জীলের অবস্থা এর চেয়ে আরো শোচনীয়। সদুদ্দেশ্যে যত ইচ্ছা ধর্মশাস্ত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা খ্রীস্টানদের মতে বৈধ। খ্রীস্টান ধর্মের নেতা বিশব ইসোবিয়স বলেন "যাহা কিছু দ্বারা আমার ধর্মের গৌরব বাড়িতে পারে আমি তাহা সবই বাইবেলে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছি। আর যাহা দ্বারা আমার ধর্মের ক্ষতি হইতে পারে আমি সেসকল গোপন করিয়া ফেলিয়াছি।" তার একথা দ্বারা সহজে অনুমান করা যায় যে, বাইবেলে কি পরিমাণ রদবদল করা হয়েছে।

খ্রীস্টীয় প্রথম যুগে ইঞ্জিলের সংখ্যা ছিল ৩৬টি এবং পত্র ছিল ১১৩টি। ৩২৫ খ্রীস্টাব্দে রোম সম্রাট কনস্টানটাইন কর্তৃক আহূত ঐতিহাসিক নিসিও বা নিকিও কাউন্সিলে খ্রীস্টান পুরোহিতগণ বাইবেলের মধ্য হতে যাচাই বাছাই করে সন্দেহজনক পুস্তিকাসমূহ চিহ্নিত করেন। এবং সেগুলোকে বাইবেল থেকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা দেন। এই পরিত্যক্ত অংশকে ইংরেজী ভাষায় Apocryphal অর্থাৎ অপ্রামাণ্য অংশ হিসেবে অবিহিত করা হয়। উক্ত সভায় যে সকল ধর্ম বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হয়েছিল সেগুলো ভোটাধিক্য দ্বারা মিমাংশিত হয়েছিল। ঐশীগ্রন্থের যাচাই ভোটের মাধ্যমে করাটা কতবড় বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ হতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

৩৬৪ খ্রীস্টাব্দে এজাতীয় আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যা 'লোডেশিয়া' কাউন্সিল নামে প্রসিদ্ধ। এবার খ্রীস্টান পুরোহিতগণের সিদ্ধান্ত মতে পূর্বের বাইবেলের সাথে আরো ৭খানা পুস্তিকা সংযোগ করে দেওয়া হয়। তাদের যাচাই বাছাইয়ে এসকল পুস্তিকা ঐশীগ্রন্থ হিসেবে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। তবে মজার ব্যাপার হলো বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ Revelation যা মূলত কিছু ভবিষ্যতবাণীর সমষ্টি, দ্বিতীয়বারের বাছাইতেও সন্দেহজনক ও অপ্রামাণ্য হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় বাদ পড়ে যায়।

৩৯৭ খ্রীস্টাব্দে এর চেয়ে আরো বড় ধরনের একটি কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। যা 'কর্থিজ' কাউন্সিল নামে প্রসিদ্ধ। এতে খ্রীস্টজগতের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা অগেস্টাইনসহ ১২৬জন খ্রীস্টান পুরোহিত অংশগ্রহণ করেন। এতে পূর্বের বাইবেলের সাথে আরো ৭টি পুস্তিকা যোগ করা হয়। বাইবেলের মাঝে এসকল রদবদল যেহেতু ইসলাম আগমনের বহু পূর্ব থেকেই হতে থাকে তাই নবীজী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে যে বাইবেল ছিল তাও বিকৃত ও পরিবর্তিত ছিল।

১২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত বাইবেল প্রচলিত ছিল। এরপর খ্রীস্টানদের মধ্যে প্রোটেস্টান নামে নতুন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। যারা পূর্ববর্তী পুরোহিতদের সিদ্ধান্ত ভুল বলে দাবী করে বাইবেল থেকে অনেকগুলো গ্রন্থ বাদ দিয়ে দেয়। এভাবে প্রোটেস্টানদের বাইবেলের অধ্যায়ের সংখ্যা দাঁড়ালো ৬৬টিতে আর ক্যথলিক খ্রীস্টানদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা হলো ৭২টি। (বাইবেল সে কুরআন তক ১/৩১৯, ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৪)

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ক্যান্টরবরি নগরে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খ্রীস্টান পণ্ডিতগণ এ সিদ্ধান্তে উপণীত হন যে, যে যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে সেই যুগে এই শেকেলে বাইবেলের সংস্কার হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সবার পক্ষ হতে এই কাজের জন্য ২৭জন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১০ বছর পরিশ্রমের পর ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে যুগোপযোগী বাইবেলের একটি নতুন সংস্করণ বের করেন। যা Revised Version নামে পরিচিত। (সমকালীন পরিবেশ ও জীবন ১৪৪-১৪৯)

ইমাম কুরতুবী (রহ.) ইঞ্জিলের ইতিহাস আলোচনা করতঃ ঐতিহাসিক কালসমূহে এর পরিক্রমণের বর্ণনা দিয়ে উল্লেখ করেন, সেই অন্ধকার যুগে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ইঞ্জিল বিনষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্যে শুধু কিছু অংশ বাকী থাকে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল বিদ্যমান থাকারতো প্রশ্নই আসে না। কেননা তা এর শত শত বছর পূর্বেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ইঞ্জিলের বহু সংখ্যক সংকলন থেকে বাছাই করে চারটি ইঞ্জিলকে নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাজেই এই গ্রন্থগুলোকে আমরা সেই ইঞ্জিল বলতে পারি না, কুরআনের প্রতিটি স্থানে যাকে এক বচনে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং যা হযরত ঈসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। (ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৭-৪১৮)

বাইবেলের বিকৃতি ও সংযোজন বিয়োজনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে তুলে ধরা হলো। এছাড়াও যুগে যুগে আরো অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধনের ইতিহাস রয়েছে। বর্তমান বাইবেলের ভিত্তি যে, কত দূর্বল তা এসকল ইতিহাস থেকে সহজে অনুমান করা যায়। এধরনের বিকৃত গ্রন্থ কখনও ঐশীবাণী হতে পারে কি না কোয়ান্টামের ভাইয়েরা একটু চিন্তা করে দেখুন।

কুরআনের আলোকে বাইবেলের মূল্যায়ন :

অতীত উম্মতের কর্মকাণ্ড জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে পবিত্র কুরআন। ঐতিহাসিক রেফারেন্সে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও কুরআন হাদীসের রেফারেন্সে বাইবেলের বিকৃতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে –

"নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল এই কিতাবের পূর্বে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং অবতীর্ণ করেছেন মিমাংসা।" (সূরা আলে ইমরান ৩-৪)

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত তাওরাত ও ইঞ্জিল দ্বারা কি বর্তমানের বাইবেল উদ্দেশ্য? যে খানে রয়েছে বহু বিতর্কিত ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট নামে দু'টি অধ্যায়। যুগে যুগে যাতে করা হয়েছে বহু সংস্কার, বর্ধন-কর্তন। যার বিশুদ্ধতা নিয়ে খোদ খ্রীস্টজগত সন্দিহান। যার মূল ভাষা আজ বিলুপ্ত। খ্রীস্টানগণ যাকে মথি, মার্ক, লুক এবং জোহনের রচিত Gospel নামে অভিহিত করে থাকে?! কখনই তা হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে তাওরাত ইঞ্জিলের আলোচনা আছে, তবে তার উদ্দেশ্য এই ওল্ড/নিউ টেস্টামেন্ট নয়। বরং তাওরাত দ্বারা সেই মূল ঐশী গ্রন্থকে বুঝায় যা হযরত মূসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর ইঞ্জিল দ্বারা সেই মূল ঐশীগ্রন্থকে বুঝায় যা হযরত ঈসা (আ.) এর উপর অবতীর্ণ হয়ে ছিল। ইহুদী খ্রীস্টানরা তাতে মনগড়া সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে মারাত্মক বিকৃতি সাধন করে।

বাইবেলের এই বিকৃতির ঘটনা মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানব জাতিকে অবহিত করে দিয়েছেন। এখানে পবিত্র কুরআন থেকে লিখিত ও মৌখিক বিকৃতির একটি করে প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

ক. ইরশাদ হচ্ছে- "অতএব তাদের জন্য আফসোস যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে...।" (সূরা আল-বাকারা ৭৯)

খ. "আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে যাতে তোমরা মনে করো যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত, অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই উপর মিথ্যারোপ করে।" (সূরা আলে ইমরান ৭৮)

আহলে কিতাবদের পক্ষ থেকে বিকৃতি সাধনের এই ছিল চিরাচরিত অবস্থা। ঐশী গ্রন্থের মাঝে নিজেদের তরফ থেকে কিছু কম বেশ করে এমন ভঙ্গিমায় তা পাঠ করত যেন অনবগত সাধারণ শ্রোতারা ধোঁকায় পড়ে যায়। এবং এগুলোকে ঐশী গ্রন্থের অংশ মনে করে নেয়। শুধু তাই নয় বরং আরো একধাপ এগিয়ে মৌখিক দাবীও করতো যে, এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ বাস্তব হলো ওই বিষয়গুলো কিতাবেও নেই আল্লাহর তরফ থেকেও অবতীর্ণ হয়নি। এমন বিকৃত গ্রন্থকে সমষ্টিগতভাবে ঐশী গ্রন্থ নয় বলে আখ্যা দেওয়া যায়। আজ বিশ্বব্যাপী বাইবেলের যে সংকলনগুলো রয়েছে তা পরস্পরে ব্যাপক বিরোধপূর্ণ। আর তাতে এমনসব উক্তি রয়েছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছুতেই হতে পারে না। (শায়খুল হিন্দ, তরজমাতুল কুরআন পৃষ্ঠা ৭৭। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানভী (রহ.) রচিত ইযহারে হক্ব দেখা যেতে পারে)

হাদীসের আলোকে বাইবেলের মূল্যায়ন :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলমানদের কাছে আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করতো। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবীদের উক্তিকে সত্য-কিংবা মিথ্যা বলো না। তবে তোমরা বল আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহকে এবং তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে।"

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় কিতাব বুখারী শরীফের তিন স্থানে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীস নং ৪৪৮৫, ৭৩৬২ ও ৭৫৪২।

যেহেতু আহলে কিতাবদের উক্তির মাঝে সত্য মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে তাই উক্ত হাদীসে তাওরাত ইঞ্জিল সম্পর্কে আহলে কিতাব তথা ইহুদী খ্রীস্টানদের কোনো উক্তির ব্যাপারে মন্তব্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেন কোনো বিষয় বাস্তব সত্য হয়ে থাকলে তা অস্বীকার করা না হয় আর মিথ্যাকেও স্বীকার করা না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "হে মুসলমানগণ তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ে) কোনো কিছু জানতে চাইলে আহলে কিতাবদের কাছে কিভাবে জিজ্ঞেস কর? অথচ তোমাদের ঐশীগ্রন্থ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আল্লাহর বিধান, যাতে কোনো মিশ্রন নেই। অপর দিকে আল্লাহ পাক

তোমাদের বলে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা (ইহুদী-খ্রীস্টান) আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং বিকৃত করে ফেলেছে। তারা সামান্য অর্থের জন্য নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করে বলছে যে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ। তোমাদের ধর্মীয় এলেম কি তাদের কাছে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করতে বাঁধা দেয় না? আল্লাহর কসম আমি তাদের কোনো লোককে তোমাদের কাছে অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি।" (বুখারী শরীফ ৭৫২৩, ৭৩৬৩)

এসকল হাদীস থেকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইহুদী-খ্রীস্টানদের কাছে ঐশী গ্রন্থ নামে যা কিছু রয়েছে তা নির্ভেজাল নয়। বরং ঐশী গ্রন্থের বিকৃত ও পরিবর্তিত রূপ মাত্র। যার সত্য মিথ্যা নিরুপণ করা দুষ্কর। তাই কুরআন সুন্নাহ থাকতে বাইবেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ আর বাইবেলের মর্মবাণী মুসলমানদের হাতে দিয়ে তা থেকে সফলতার সূত্র সন্ধানের আহবান কোয়ান্টামের জন্য বৈধ হচ্ছে না।

বাইবেল চর্চা :

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ বুখারী শরীফের একটি অনুচ্ছেদের শীর্ষে (তরজমাতুল বাব) একটি হাদীস অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন– "কিতাবীগণের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করো না।" (বুখারী শরীফ অধ্যায় ৯৬, অনুচ্ছেদ ২৫)

তবে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি এভাবে উল্লেখ রয়েছে।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবেত আনসারী (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আহলে কিতাবদের (ধর্মীয় বিষয়ে) প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক। কেননা যারা স্বয়ং নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করেছে তারা তোমাদের হেদায়াতের পথ দেখাতে পারবে না। অন্যথায় তোমরা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে ফেলবে।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে অপর বর্ণনায় রয়েছে– "তোমরা আহলে কিতাবের কাছে (ধর্মীয়) কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না। কেননা যারা স্বয়ং পথভ্রষ্ট তারা তোমাদের পথের দিশা দেখাতে পারবে না। অন্যথায় তোমরা কোনো সত্য বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ফেলবে বা ভ্রান্তকে সত্যায়ন করে ফেলবে।" (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক - ১৯২১২, অনুরূপ হাদীস মুসনাদে আহমদ ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ও মুসনাদে বাযযারে রয়েছে)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর কাছে এক ব্যক্তি কিছু উপঢৌকন পাঠালে তিনি বললেন, তার উপঢৌকন আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, সে নাকি পূর্ববর্তী কিতাবাদী নিয়ে গবেষণা করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "এটাকি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়।" (আল মওসূআতুল ফিকহিয়্যা কুয়েত- ৩৪/১৮৪)

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, বাইবেলের অনুসারী ইহুদী খ্রীস্টানদের কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান লাভের আশা করা বা বাইবেল চর্চা করা এবং এর মর্মবাণী অনুধাবনের চেষ্টা বৈধ হতে পারে না।

বাইবেল লেখা ও পড়া :

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর ঘর মদীনা শরীফ থেকে ২/৩ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হাজির হওয়ার পথে আহলে কিতাবদের কিছু বসতি ছিল। জ্ঞান পিপাসু হযরত উমর (রা.) কোনো কোনো সময় তাদের মজলিসে গিয়ে বসতেন। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথা জানতে পেরে যারপর নাই অসন্তুষ্ট হলেন। হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত এসংক্রান্ত একটি হাদীসে এসেছে– "একদা হযরত উমর (রা.) নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন আমরা ইহুদীদের কাছ থেকে তাদের (ধর্মীয়) অনেক কথা শুনি। যা আমদেরকে প্রীত করে। আপনি কি আমাদেরকে তা লিখে রাখার অনুমতি দেবেন? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা কি নিজেদের শরীয়তের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছো, যেমন ইহুদী-খ্রীস্টানরা করেছিলো? জেনে রাখ! আমি তোমাদের কাছে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছি। যদি মূসা (আ.) নিজেও জীবিত থাকতেন আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোনো উপায় থাকত না। (মেশকাত ১৭৭, মুসনাদে আহমদ ১৫১৫৬, বায়হাকী ১৭৭)

এখানে হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বাইবেলের মত গ্রন্থের মর্মবাণী লিখে সংরক্ষণের অনুমতি প্রার্থনার ফলে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধমকের সুরে বলে উঠলেন তোমরা অন্যদের ধর্মগ্রন্থ থেকে ইলম অর্জন করতে চাচ্ছ কেন? নিজের ধর্মের ব্যাপারে কি তোমরা সন্দিহান হয়ে পড়লে? যেভাবে ইহুদী-খ্রীস্টানরা ধর্মের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে ঐশী গ্রন্থ ছেড়ে, নবীর প্রকৃত শিক্ষা ত্যাগ করে, প্রবৃত্তি পূজারী অর্থলিপ্সু রাহেব ও পাদ্রীদের অনুসারী হয়ে পড়েছে। তোমরাও কি তাদের মত দ্বিধান্বিত হয়ে অন্য ধর্মের মোখাপেক্ষী হয়ে পড়েছ? অথচ আমার আনীত শরীয়ত এত স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ যে, আজ মূসা (আ.)ও যদি থাকতেন তবে তিনিও সকল কথা ও কাজে আমার

শরীয়তের অনুসারী হতেন। আর তোমরা কি না আমার উপস্থিতিতে তাঁর উম্মত তথা ইহুদীদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে চাও। এই কাজ তোমাদের জন্য কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। (মেরকাত ১/৪২৩, মাজাহেরে হক্ব ১/২১৮)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন কঠোর ভাষায় হযরত উমর (রা.)কে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে, অন্য ধর্মের গ্রন্থ লেখার অনুমতি চাওয়ার দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, তারা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনীত শরীয়তকে অপূর্ণাঙ্গ বলে বিশ্বাস করে। তাই এত কঠোরভাবে বারণ করেছেন। (আত্তালীকুস সবীহ ১/১৩১)

অপর হাদীসে এসেছে, "হযরত উমর (রা.) একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জনৈক আহলে কিতাবের কাছ থেকে পাওয়া একটি পুস্তিকা নিয়ে হাজির হলেন, এবং তা পাঠ করতে লাগলেন, এতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি তোমাদের কাছে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট শরীয়ত নিয়ে এসেছি। আহলে কিতাবদের কাছে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করো না। অন্যথায় তারা কোনো সত্য বিষয় তোমাদের কাছে পৌঁছালে তোমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ফেলবে অথবা ভ্রান্ত বিষয় পৌঁছালে সত্যায়ন করে ফেলবে। ওই সত্তার কসম যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ যদি মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন তবে তিনিও আমার অনুসরণে বাধ্য হতেন।" (মুসনাদে আহমদ ১৫১৬৪, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২৬৯৪৯)

বিশ্ব বিখ্যাত ফতাওয়া গ্রন্থ ফতাওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে, "তাওরাত ইঞ্জিল দেখতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। চাই আমাদের কাছে তা ইহুদী খ্রীস্টানগণ বর্ণনা করুক বা তাদের মধ্য হতে ইসলামগ্রহণকারী কেউ বর্ণনা করুক।" (ফতাওয়ায়ে শামী ১/১৭৫, এইচ এম সাঈদ)

সার কথা হলো বাইবেল নিয়ে পড়াশোনা করা এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষেধ। এ ধরনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোয়ান্টাম মেথড বেদ বাইবেলে সফলতার সূত্র সন্ধানে ব্রতী হয়ে এদেশের সরলমনা ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণকে বোকা বানাতে সচেষ্ট রয়েছে।

বাইবেল প্রচার :

যেভাবে বাইবেলের চর্চা বা শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে পড়াশোনা নিষিদ্ধ তদ্রুপ বাইবেলের প্রচার বা মর্মবাণী বর্ণনা করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবু নামলা আনসারী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাশ দিয়ে জনৈক ইহুদী একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করল : হে মুহাম্মদ! বলুন তো দেখি এই লাশ কি কথা বলতে পারে? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহই ভাল জানেন। ইহুদী বলল, হ্যাঁ সে কথা বলতে পারে। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আহলে কিতাবগণ তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করে তা সত্যায়নও করোনা এবং মিথ্যা প্রতিপণ্যও করো না। বরং তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর সকল রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছি। অতঃপর যদি তা ভ্রান্ত হয় তবে তার সত্যায়ন থেকে বেঁচে যাবে আর হক্ব হলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বেঁচে যাবে। (আবু দাউদ-৩৬৪৪)

এই হাদীস থেকে একথা প্রমাণ হলো যে, আহলে কিতাব তথা ইহুদী খ্রীস্টানদের ধর্মীয় বিষয় বর্ণনা করা বা প্রচার-প্রকাশ করা নিষেধ। যেহেতু তাদের সূত্রে বর্ণিত ধর্মবাণীর সত্যতা নিশ্চিতরূপে যাচাই সম্ভব নয়। উপরন্তু কুরআনে তাদের ধর্ম বিকৃতির স্বাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাই ঈমানদারের কর্তব্য। আর সকল নবী রাসূল ও তাঁদের উপর অবতীর্ণ ঐশী বাণীর উপর শুধু মাত্র সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল তা বর্তমানের এই বাইবেল নয়। বিকৃত এই বাইবেলকে অনুসরণীয় মনে করা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত শরীয়তকে অর্ধাঙ্গ মনে করার শামিল। তাই বাইবেলের প্রচার প্রসার কোনো কিছুই শরীয়ত সম্মত নয়। কোয়ান্টামের বাইবেল কনিকাসহ ভিন্ন ধর্মের সকল প্রচারণা অবৈধ ও হারাম। এমন গর্হিত কাজকে ধর্মসম্মত বলা অজ্ঞতা না হলে অজ্ঞতার সংজ্ঞা নতুন করে নির্ণয় করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, কোয়ান্টাম কনিকায় যদিও বাইবেলের সাথে সাথে হিন্দু ধর্মের বেদ, ও বৌদ্ধ ধর্মের ধম্মপদের মর্মবাণীও প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু তাওরাত ইঞ্জিলের মত ওই সকল গ্রন্থ ঐশী বাণী হওয়ার কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই বিধায় তার আলোচনা পরিহার করা হলো।

পর্দা : গুরুত্ব ও সীমারেখা

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

পর্দার বিধান নিশ্চয় একটি ধর্মীয় ও শরয়ী বিষয়। কিন্তু পর্দার বিধান ও হুকুমটাই শরীয়তের মূখ্য উদ্দেশ্য নয় বরং এর মাধ্যমে ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক এক ফিৎনা তথা বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, উলঙ্গপনা ও কালিমাময় বেলেল্লাপনার পথ রুদ্ধ করাই মূল উদ্দেশ্য। পর্দাহীনতার এই ধ্বংসাত্মক ফিৎনা মানবতা ও মানব সমাজের জন্য মরণঘাতক এবং মানব জনগোষ্ঠী ধ্বংস হওয়ার প্রথম ধাপ। তাই পবিত্রময় ইসলামী শরীয়ত বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে ইসলামী সমাজকে রক্ষা করার জন্য পর্দার বিধান আরোপ করেছে।

ইসলাম পর্দার এমন এক আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন ও উন্নত বিধান পেশ করেছে, যার এক দিকে রয়েছে উৎকৃষ্ট চরিত্র ও মহিলাদের ইজ্জত আব্রুর জামানত, অপর দিকে রয়েছে জাগতিক ও বস্তুগত কল্যাণ এবং মানবতা ও মানব সমাজের সংরক্ষণ। যার গণ্ডিতে না পা রাখতে পারে যেনা ব্যাভিচার, না চলতে পারে ব্যাভিচারের কোনো উপকরণ ও ব্যাভিচারের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টিকারী কোনো আচরণ।

পর্দার গুরুত্বের উপর পবিত্র কুরআনে করীমের মধ্যে ৭ টি আয়াত ও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস সম্ভারের মধ্যে অন্তত ১৭টির অধিক হাদীস রয়েছে। যা নারীদের পর্দা পালনের নির্দেশ প্রদান করে। ওই সকল আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে গবেষণা করলে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের জন্য আসল পর্দা হলো তাদের ঘরের চৌহদ্দী। কেননা মহিলারা হল মূল্যবান গুপ্ত ধনের মত যাকে শুধু ওই ব্যক্তিই কাজে লাগাতে পারে বা কাজে লাগানোর অধিকার রাখে। যিনি শরীয়তের দৃষ্টিতে বাস্তবে ওই গুপ্ত ধন বা অমূল্য সম্পদের মালিক হবেন। যার মাধ্যমে সতিত্ব ও সততার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই গুপ্ত অমূল্য সম্পদ যদি তার নির্ধারিত স্থান থেকে অকারণে অর্থাৎ শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বেরিয়ে গায়রে মাহরামদের সামনে চলে আসে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে অপর পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশায় মেতে ওঠে এবং এর দ্বারা নির্লজ্জতা ও উলঙ্গপনা, বেলেল্লাপনার পথ উন্মুচিত হয়ে যায়। তখন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এবং চরিত্রহীনতার ঢেউ আঁচড়ে পড়বে সমাজের সর্বত্র। তাই পবিত্র ইসলামী শরীয়তের মধ্যে সর্বপ্রথম মহিলা সমাজকে তাদের ঘরের চৌহদ্দীর মধ্যে বসবাসের নির্দেশনা প্রদান করেছে। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন وقرن فى بيوتكن (সূরা আহযাব আয়াত ৩৩) অর্থাৎ আর তোমরা নিজ নিজ ঘরেই অবস্থান কর। তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন, واذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب (সূরা আহযাব আয়াত ৫৩) আর যখন তোমরা (পুরুষরা) তাদের থেকে (মহিলা) কোনো বস্তু চাও তখন পর্দার অন্তরাল থেকে চাও। উল্লেখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের জন্য আসল পর্দা হল তাদের নিজ নিজ ঘরের মধ্যে বসে থাকা। যাতে তাদের শরীরের কোনো অংশ পুরুষদের সামনে প্রকাশ না পায় এবং পর্দার গুরুত্ব এত কঠোর যে, মহিলাদেরকে তাদের অলংকারের আওয়াজকেও সংবরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং গায়রে মাহরাম পুরুষদেরকে তাদের আওয়াজ প্রকাশ করা থেকে পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن (সূরায়ে নূর আয়াত ৩১)

অর্থাৎ (পর্দার এতটুকু গুরুত্ব দিবে যে, চলা ফেরার ক্ষেত্রে) তাদের পা জোরে রাখবে না। যাতে কখনও তাদের গোপন অলংকার সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان

(মিশকাত হাদীস নং ২৬৮)

অর্থাৎ মহিলা পর্দার অন্তরালে থাকার জিনিস। উদাহরণ স্বরূপ যখন কোনো মহিলা আপন পর্দা থেকে বের হয় তখন শয়তান তাকে পুরুষদের সামনে রূপসী বানিয়ে দেখায়।

হযরত উম্মে হুমাইদ যাইদিয়া মহিলা সাহাবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনের বাসনা হল যে, আমি আপনার সাথেই নামায আদায় করি, তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

قد علمت انك تحبين الصلوة معى وصلوتك فى بيتك خير لك من صلوتك فى حجرتك وصلوتك فى حجرتك خير لك من صلوتك فى دارك وصلوتك فى دارك خير لك من صلوتك فى مسجد قومك وصلوتك فى مسجد قومك خير لك من صلوتك فى مسجدى (احكام القرآن المسمى بدلائل القرآن على مسائل النعمان ٢٨٤/٥)

অর্থাৎ আমি বুঝতে পেরেছি সংক্ষেপ কথা হল এই যে, তোমার নামায তোমার ঘরের কুঠরীতে উত্তম ঘরের দালানের চেয়ে, ঘরের দালানে তোমার নামায উত্তম তোমার ঘরের আঙ্গিনার চেয়ে এবং ঘরের আঙ্গিনায় তোমার নামায উত্তম তোমার মহল্লার মসজিদের নামাযের চেয়ে এবং তোমার মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করা উত্তম আমার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে।

ভেবে দেখুন! নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তাও আবার মসজিদে নববীর মত অধিক পূণ্যময় স্থানে স্বয়ং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পিছনে ইকতিদা করার মাধ্যমে এবং সাহাবায়ে কেরামের এমন পূত পবিত্রময় জামাআতের সাথে যাদের সততা ও পবিত্রতা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জন্য সততা ও পবিত্রতা রক্ষার সর্বোত্তম উজ্জল দৃষ্টান্ত। এতদ সত্বেও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই মহিলা সাহাবীকে নিজের ঘরের নির্জন কুঠরীতে নামায পড়া উত্তম বলে সিদ্ধান্ত দেওয়ার মাধ্যমে এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহিলার জন্য জন্মগত পরিবেশই হল তার ঘরের দেওয়ালের চৌহদ্দী।

প্রিয় পাঠক সমাজ! উল্লেখিত কুরআনের আয়াতসমূহ ও হাদীসে রাসূলের উপর ভিত্তি করে মুসলিম জাতির বিশেষজ্ঞগণ যাদেরকে ফক্বীহ বলা হয় তারা ফতওয়া জারি করেছেন যে, মহিলাদের জন্য শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া হারাম ও কবীরা গোনাহ।

আল্লামা আলুসী (রহ.) তার রচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ রূহুল মা'আনীতে লেখেন

وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور اذا اعظمت مفسدته وخروجهن ولو الى المسجد وقد استعطرن وتزين اذا تحققت الفتنة ، واما اذا ظنت فهو حرام غير كبيرة وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الاموات من الاقارب ونحو ذلك فانما يجوز بشروط مذكورة فى محلها (روح المعانى ١١/١٨٨)

ইসলাম গোঁড়া কোনো ধর্ম নয় যে, শুধু মহিলাদেরকে তাদের ঘরের কোণেই আবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেয় বরং তাদের শরয়ী প্রয়োজনের স্বার্থে তাদেরকে ঘরের বাহিরে যাওয়ার অনুমতিও প্রদান করেছে। তবে সমাজের নির্লজ্জ ফিৎনার প্রেক্ষিতে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বেশ কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে, যথা মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

يا ايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن (الاحزاب ٥٩)

হে নবী আপনি আপনার স্ত্রীদের ও মেয়েদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন যে, নিজেদের মাথার উড়না মাথা থেকে সামান্য নিচু করে চেহারার উপর আবৃত করে দেয়।

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মহিলাদের পর্দার ধরন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কোনো মহিলা যখন শরয়ী কোনো প্রয়োজনের খাতিরে ঘর থেকে বের হবে তখন একটি বড় চাদর (উড়না) দ্বারা নিজের মাথা এবং মুখমণ্ডলকে পরিপূর্ণ ঢেকে বের হবে। তবে পথ দেখার জন্য কেবল একটা চোখ খোলা রাখবে।

امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن فى حاجة ان يغطيهن وجوهن من فوق رؤسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة (تفسير ابن كثير ٥/٣١)

এ ক্ষেত্রে মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন –

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى (الاحزاب ٣٣)

এবং আদি বর্বর যুগের ফ্যাশন মত (যাতে পর্দা হীনতার উপস্থিতি ছিল) চলা ফেরা করিও না।

উল্লেখিত আয়াতে تبرج শব্দের অর্থ হল মহিলা পরপুরুষের সামনে নিজের খোদাপ্রদত্ত সৌন্দর্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা যদ্দরুন পুরুষের অন্তরে তার দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তাই উক্ত আয়াতের মর্মার্থ এই দাড়ায় যে, হে নারী সমাজ! ইসলাম ধর্ম আসার পর তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য্যকে এমনভাবে প্রকাশ করোনা যেভাবে ইসলামের শালিনতার যুগের পূর্বে মহিলারা নিজেদের সৌন্দর্য্যকে জাহির করতো।

মহিলাদের যদি কোনো বিশেষ শরয়ী প্রয়োজনে ঘরের বাইরে নিরুপায় হয়ে যেতেই হয় তাহলে তাদেরকে নিম্নের বর্ণিত শর্ত মেনে চলতে হবে। যার লংঘণ শরীয়তের সীমানা লংঘনের শামিল হবে।

১। সাজগোজ করে এবং খুশবো ব্যবহার করে বের হওয়া যাবে না। অর্থাৎ এমন কোনো প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করা যাবে না যার মধ্যে ঘ্রাণ আছে।

২। বাজনা ধারী অলংকার পরিধান করা যাবে না।

৩। নর্তকীদের মত কোমর দোলিয়ে হাঁটা যাবে না।

৪। মাঝ পথে চলা পরিহার করে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলতে হবে।

৫। বাহিরে যাওয়াটা অভিভাবকের অনুমতি স্বাপেক্ষে হতে হবে।

৬। রাস্তায় চলার সময় চক্ষুদ্বয় সদা নিচের দিকে রাখতে হবে।

৭। চলার পথে পুরুষদের ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে।

উল্লেখিত বিস্তারিত আলোচনা থেকে পরিষ্কার ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পর্দার মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য শুধু মহিলাদের সতিত্ব রক্ষা করা নয় বরং এর মাধ্যমে ইসলামী সোসাইটি, সমাজ ও সমাজের প্রতিটি নাগরিকের মধ্য থেকে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনাকে উৎখাত করা যার মূল ভিত্তি ও কারণেই হল মহিলাদের পর্দাহীনতা ও লাগামহীন স্বাধীনতা। এজন্যই ইসলাম মহিলাদের উপর পর্দার মূল বিধান আরোপ করার মাধ্যমে তাদেরকে ঘরের চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা ও বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়ার পাবন্দী আরোপ করেছে।

চেহরা/মুখমণ্ডলের পর্দা ইসলামে আছে কি না?

বলাই বাহুল্য যে, এক্ষেত্রে দুইটা জিনিস আমাদেরকে পৃথক পৃথক বুঝে নিতে হবে–

১। সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা যাকে ছতরে

আওরত বলা হয়। ২। পরপুরুষ এবং গায়রে মাহরামদের থেকে পর্দা করা। এই দুটো জিনিস কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক আলাদা জিনিস। উভয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটা পার্থক্য আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১। সমস্ত শরীর আবৃত করা তথা ছতরে আওরাত এটা ওই সব জন্মগত কালচারের মধ্য থেকে অন্যতম যা ফরজ হওয়ার উপর আল্লাহ প্রেরিত সমস্ত নবী রাসূলগণের শরীয়ত ঐক্যবদ্ধ বরং হযরত আদম আ. জান্নাত থেকে জমীনে অবতরণ করার পূর্বেও এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা পবিত্র কুরআন করীমের বর্ণনা মতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের মাধ্যমে হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. এর শরীর থেকে জান্নাতের পরিহিত পোশাক যখন খুলে নেওয়া হল তখন তাঁরা উভয়ে তাদের শরীর প্রকাশ পাওয়াটা সহ্য করেনি। বরং অনতি বিলম্বে তা ঢাঁকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। যার লক্ষ্যে গাছের পাতাদ্বারা নিজের শরীর ঢেঁকে নিতে অপরিসীম চেষ্টা করেছেন। যাতে ছতর ঢাঁকা হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة (سوره طه ١٢١)

বিশিষ্ট দার্শনিক শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তার স্বরচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা নামক গ্রন্থে লিখেন –

فاتفقوا مثلا ـــــ على ستر سوأتهم (١١٤/١ باب اتفاق الناس على اصول الارتفاقات)

অর্থাৎ শরীর ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে সবার ঐক্যবদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। অথচ পরপুরুষ ও গায়রে মাহরামদের থেকে পর্দা করার বিধান নাযিল হয়েছিল হিজরতের পঞ্চম বর্ষে।

২। ছতর ঢাঁকা সর্বাবস্থায় ফরজ। কেউ দেখলেও না দেখলেও। এ জন্যই ইসলামী ফিকহ বিশারদগণ নির্জনে একাবস্থায়ও দিগম্বর হয়ে নামায পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা ওই অবস্থায়ও সমস্ত শরীর ঢেঁকে রাখার শর্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু পর্দা ওই সময় ফরজ হয় যখন পরপুরুষের দৃষ্টি সীমার মধ্যে চলে আসার সম্ভাবনা থাকে।

৩। ছতর ঢাকার বিধান নারী পুরুষ সবার জন্য সমান অথচ পর্দার বিধান বিশেষভাবে শুধু মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য।

উল্লেখিত পার্থক্যগুলো স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মহিলাদের জন্য সারা শরীর আবৃত করে রাখা ফরজ। সুতরাং কোনো মহিলা যদি মাথা খোলা রেখে নামায আদায় করে তবে তার নামায হবে না। ছতর ঢাঁকার উক্ত হুকুমের মধ্যে মহিলার চেহরা মুখমণ্ডল ও হাতও অন্তর্ভুক্ত। তবে পারিবারিক কার্যাদী আঞ্জাম দেওয়ার সময় শরীয়ত তাদেরকে মুখ ও হাত খোলা রাখার অনুমতি প্রদান করার মাধ্যমে সর্বদা হাত, মুখ, খোলা রাখার উপর কঠোরতা পরিহার করে উদারতার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে পরপুরুষের সামনে তাদের চেহারা ও হাত, পা খোলা রাখার মাধ্যমে যেহেতু বেহায়াপনা বিস্তার লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়ে যায় তাই তাদের সামনে তাও পর্দা করার নির্দেশনা শরীয়ত আরোপ করেছে।

ছতর ঢাঁকা ও পর্দার মধ্যে এই বিশাল ব্যবধানটা বুঝতে না পেরে অনেকেরই সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, ইসলামে মহিলাদের চেহারা পর্দা করার কোনো বিধান নেই। বরং মহিলারা তাদের মুখমণ্ডল খোলা রেখেই পরপুরুষের সামনে অবাধ আসা যাওয়া করতে পারবে। অথচ পবিত্র কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –

ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها (سوره نور ٣١)

অর্থাৎ তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর বিশারদগণ বলেন, নারীর কোনো সাজ সজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য সে সব অঙ্গ ব্যতীত যেগুলো আপনাআপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কাজ কর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বভাবত খোলেই যায় এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোনো গোনাহ নেই। (তাফসীরে ইবনে কাসীর) এতে কোন কোন অঙ্গ বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মসউদ ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর তাফসীর বিভিন্ন রূপ ।

হযরত ইবনে মসউদ (রা.) বলেন, ماظهر منها বাক্যে উপরের কাপড় যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজ সজ্জার পোশাককে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজন বশত: বাহিরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভব নয় সেগুলো ব্যতীত সাজ সজ্জার কোনো বস্তু প্রকাশ করা জায়েয নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বুঝানো হয়েছে। কেননা কোনো নারী প্রয়োজন বশত: বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলা ফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃতকরা দুরুহ হয়। অতএব হযরত ইবনে মাসউদের তাফসীর অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ও খোলা রাখা জায়েয নয়। শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজন বশত: খুলতে পারে।পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর তাফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। এ কারণে ফেকাহবিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের

তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে তবে এগুলো দেখা জায়েয নয়। এবং নারীর জন্যে এগুলো প্রকাশ করা ও জায়েয নয়। এমনিভাবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাযে সর্ব সম্মতিক্রমে ফরজ এবং নামাযের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরজ তা থেকে মুখমন্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রম ভুক্ত। এ গুলো খুলে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ ও দুরস্ত হবে।

কাজী বয়যাভী ও খাজেন এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, নারীর আসল বিধান এই যে, তার সাজ সজ্জার কোনো কিছুই প্রকাশ করবেনা। তবে চলাফেরা ও কাজ কর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায় সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর ও মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোনো প্রয়োজনে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেনদেনের প্রয়োজনে কোনো সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও গোনাহ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমানিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা ও পুরুষদের জন্য জায়েয।বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়ত সম্মত উযর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। (মা'আরিফুল কুরআন)

উল্লেখিত তাফসীর দ্বারা বুঝা যায় যে, (১) পবিত্র কুরআনের বাক্য الا ماظهر দ্বারা মহিলাদের মুখমণ্ডল বুঝানো উদ্দেশ্যই নয় আর যদি এই বাক্য দ্বারা মুখমণ্ডল প্রকাশ করা উদ্দেশ্য তা ধরেও নেওয়া হয় তবেও তার সম্পর্ক শুধু মাত্র মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং শরয়ী উযর ব্যতীত বেগানা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল খুলা রাখা না জায়েয।

(২) মহিলাদেরকে তাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার অনুমতি ওই সংকীর্ণতা ও কষ্ট দূর করার জন্য ইসলাম দিয়েছে যার সম্মূখীন মুখমণ্ডল ঢেকে পারিবারিক কাজ করার মধ্যে হতো, অথচ পর পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল আবৃত করার মধ্যে এমন কোনো কষ্ট বা সংকীর্ণতা নেই যে, তা দূর করার জন্য তাদেরকে তাদের মুখমণ্ডল খুলা রাখার অনুমতি দিতে হবে।

(৩) উক্ত আয়াতের শেষে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন

ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে যদ্দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে ওঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অলঙ্কারের সৃষ্ট আওয়াজকেও বেগানা পুরুষদেরকে না শুনানোর উক্ত নির্দেশনা দ্বারা সহজে প্রমাণিত হয় যে, তাদের সামনে আপন মুখমণ্ডল খুলার নিষেধাজ্ঞা কত কঠোর হবে। ইমাম আবুবকর জাস্‌সাস রাজী তার স্বরচিত গ্রন্থ আহকামুল কুরআনের মধ্যে লিখেন:

قد عقل من معنى اللفظ النهى عن ابداء الزينة واظهار ها لورود النص فى النهى عن اسماع صوتها اذ كان اظهارا لزينة اولى بالنهى مما يعلم به الزينة فاذا لم يجز باخفى الوجهين لم يجز باظهرهما (٤٤٥/٣)

৪। নারীদের মুখমণ্ডল সমস্ত সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং মুর্তপ্রতিক যদি সারা শরীর আবৃত থাকে এবং শুধু মুখমণ্ডলটাই খুলা থাকে, ইসলামী সমাজ ও সোসাইটির নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা বিস্তারের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতাই আর বাকী থাকে? বিশেষত বর্তমান যুগে এই ফিৎনা থেকে রক্ষা পাওয়া কিভাবেই বা সম্ভব? যখন গোনাহ ও ছওয়াবের মধ্যে পার্থক্য করাটা হারিয়ে গেছে। মানুষের মন মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে গেছে। নির্লজ্জতা অহংকারে পরিণত হয়েছে এবং পর্দাহীনতা প্রশংসার বস্তুতে রূপ নিয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ দলাইলুল কুরআনের মধ্যে লিখেন–

الحاصل ان النظر الى الاجنبية وكفيها حرام عن المالكية والشافعية والحنابلة سواء خيفت الفتنة اولا ـــ ومشائخ الحنفية كالجصاص والقهستانى لمار او ان هذه المواضع الشاذة ايضا كادت تنعدم فى عصرهم فساد الزمان حكموا بمنع الشابة عن كشف وجهها بين الاجانب

সার কথা হলো ইসলামের পবিত্র বিধানে যেমন মহিলাদের জন্য তাদের সারা শরীর আবৃত করে রাখার বিধান রেখেছেন তদ্রুপ তাদের জন্য বেগানা পুরুষ ও গাইরে মাহরামদের সামনে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখারও বিধান রেখেছেন শরয়ী জরুরত ও উযর ছাড়া তাদের সামনে মুখমণ্ডল খুলা জায়েয নাই।

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাজী তার সরচিত গ্রন্থ আহকামুল কুরআনের মধ্যে আরো লিখেন–

"يدنين عليهن من جلابيبهن" قال ابوبكر فى هذه الآية دلالة على ان المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الاجنبيين واظها رالستر والعفاف عند الخروج (احكام القرآن ٥٤٦/٣)

মহান রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে প্রার্থনা যে ইসলামের ধারক সেজে যে সমস্ত পণ্ডিত ও স্কলাররা বা উদারপন্থার নামে ইসলাম নিশ্চিহ্নকারী দল বা গোষ্টির চমকপ্রদ বক্তব্য, ল্যাকচার ও লিখনির ধ্বংসাত্বক আক্রমন ও পাতানো ফাঁদ থেকে আল্লাহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করুন। এবং নামায, রোজার মত পালনীয় ফরজ বিধান শরীয় পর্দা অবলম্বন করে খোদা দ্রুহীতার অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দান করুন আমীন।

স্মরণ
সাহাবী জীবন

ইসলামের চতুর্থ খলীফা
হযরত আলী (রা.)

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

নাম ও পরিচয় :
নাম, আলী। উপনাম: আবুল হাসান ও আবু তোরাব। উপাধি: হায়দার। পিতা: আবু তালেব। মাতা: ফাতেমা। তিনি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আপন চাচাত ভাই এবং পরে তাঁর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মাত্র দশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। অল্পবয়স্কদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান।

চরিত্র ও গুণাবলী :
বর্ণিত আছে হযরত মু'আবিয়া (রা.) একবার হযরত আলী (রা.) এর বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং পুরাতন দোস্ত হযরত জেরার ইবনে জামারাহকে বললেন, আলী ইবনে আবী তালেবের গুণাবলী বর্ণনা করুন। যেহেতু হযরত জেরার (রা.) তাদের মতানৈক্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, তাই তিনি চিন্তা করলেন, যদি আমি সত্য বলি হয়ত তিনি নারায হবেন, আর অসত্য বলা তাঁর মনঃপুত নয়। তাই বললেন, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রা.) গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করলেন। অবশেষে হযরত জেরার (রা.) রাজী হলেন। তখন তিনি হযরত আলীর (রা.) চরিত্রের যে আকর্ষণীয় চিত্র তুলে ধরলেন তার সার সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলো। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) কথা সংক্ষেপ করতেন। ফায়সালা করতেন ন্যায় সঙ্গতভাবে। ইহকালের জাঁকজমক তাঁর অপসন্দনীয় ছিল। অমসৃণ কাপড় ও সাধারণ খাবার ছিল তাঁর মনঃপুত। সাধারণ লোকদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতেন। আল্লাহর কসম তিনি এমনভাবে চলতেন যে, মনে হতো তিনি আমাদের মতই একজন লোক। আমরা কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি গুরুত্বের সাথে উত্তর দিতেন। ডাকলে নিজেই চলে আসতেন। দ্বীনদারদের সম্মান করতেন। ক্ষমতাবানরা ভুল বিষয়ে তাঁর পক্ষ থেকে সহায়তার আশা করতেন না। এবং দুর্বলরা তাঁর ন্যায় বিচার থেকে নৈরাশ হতেন না। আল্লাহ পাক সাক্ষী , আমি তাঁকে ক্রন্দনরত অবস্থায় একথা বলতে শুনেছি "হে দুনিয়া! তুমি আমাকে তুষ্ট করার জন্য এসেছ? দূর হও! দুর হও! আমি ব্যতীত অন্যকে ধোকা দাও। আমিতো তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি। এখন তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করার প্রশ্নই আসেনা। হে দুনিয়া! তোমার বয়স সামান্য। তোমার স্বাচ্ছন্দ্য নগন্য। তোমার ভয়াবহতা অসাধারণ। আফসোস! আমার আখিরাতের পাথেয় অল্প। অথচ সফর অনেক লম্বা এবং ভয়ের।

এ বর্ণনা শুনার পর হযরত মু'আবিয়ার (রা.) চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। উপস্থিত সকলই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। হযরত মু'আবিয়া (রা.) আবেগময় সূরে বললেন, আল্লাহ পাক আবুল হাসানের উপর দয়া করুন। আল্লাহর কসম। তিনি এমনই ছিলেন।

অসাধারণ সতর্কতা :
তিনি নিজ শাসন আমলে ও ক্ষমতার দাপট দেখাতেন না। যদি বাজার থেকে কোনো পণ্য ক্রয় করার প্রয়োজন হতো, তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন যেন তাঁকে কোনো ব্যবসায়ী চিনতে না পারেন। এবং তাঁর দিকে লক্ষ্য করে কেউ যেন মূল্য ছাড় না দেয়।

একবার জামার প্রয়োজনে তিনি এমন বেশে বাজারে গেলেন, মনে হতো একজন গ্রাম্যলোক। তিনি জামা ক্রয় করার জন্য ঘোরা ফেরা করছেন। কেউ চিনতে পারলে সেখান থেকে সরে পড়তেন। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর একজন অল্পবয়স্ক ছেলে পেলেন যে তাঁকে চিনতে পারেনি। তার থেকে তিন দেরহামের বিনিময়ে একটি জামা ক্রয় করলেন। তিনি জামাটি নিয়ে ঘরে পৌঁছতেই সে ছেলের পিতা দৌড়ে আসলেন। এবং আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমেনীন। আমার ছেলে ভুলে জামার দাম বেশি নিয়েছে। জামাটির প্রকৃত মূল্য ছিল দু'দেরহাম। দয়াকরে এই এক দেরহাম ফেরত নিন। কিন্তু তিনি কোনো ক্রমেই রাজি হলেন না। এবং বললেন, এ বেচা কেনা তো উভয়ের সন্তুষ্টিতে হয়েছে। সুতরাং এক দেরহাম ফেরত নেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

বাইতুল মালের সম্পদ বর্জন :
অনেক সময় খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়া সত্বেও তিনি লাগাতার অনাহারে থাকতেন। এমনকি নিরূপায় হয়ে প্রিয়তম বস্তু বিক্রি করে দিতেন। এতদসত্বেও তিনি কোনো সময় রাজস্ব সম্পদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। একদা লোকজন দেখলেন তিনি বাজারে দাঁড়িয়ে একটি তরবারী বিক্রি করছেন। এবং বললেন: আল্লাহর কসম এটি ওই তরবারী যার সাহায্যে আমি অনেকবার রাসূল (সা.) এর চেহারা মোবারক থেকে পেরেশানীর ছাপ দুর করেছি। যদি আমার নিকট একটি চাদর ক্রয় করার পরিমাণ মূল্য থাকতো তাহলে আমি তরবারীটি কখনো বিক্রি করতাম না।

রাজস্ব সম্পদ বর্জনের একটি ঘটনা :
একবার কোনো জায়গা থেকে তাঁর নিকট হাদিয়া স্বরূপ কিছু মধু এবং ঘি আসে। কিন্তু তিনি খলীফা থাকাবস্থায় উক্ত হাদিয়া কবুল করা পছন্দ করেননি। তাই তিনি তা বায়তুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেখানে কিছু মধু ও ঘি কম দেখলেন। তদন্ত করার পর জানতে

পারলেন যে, তাঁর মেয়ে উম্মেকুলসুম হাদিয়া মনে করে সেখান থেকে কিছু নিয়ে নিয়েছেন। তাই তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে তার মেয়ের নেওয়া মধুও ঘিয়ের পরিমাণ নির্ণয় করে বায়তুল মালে দিয়ে দেন। এরপর তিনি স্বস্তি লাভ করলেন।

পুনঃতদন্ত:

একদা তাঁর কন্যার নিকট একটি মুক্তা দেখলে জিজ্ঞাসা করলেন, বায়তুল মালের এই মুক্তা তোমার নিকট কীভাবে এলো? তাঁর লাল চোখ দেখে ভয়ে তাঁর কন্যা নিশ্চুপ হয়ে যান। তিনি পুনরায় শাসিয়ে বললেন, বল তুমি এই মুক্তা কোত্থেকে পেলে? অন্যথায় চুরির দায়ে তোমার হাত কেটে দেওয়া হবে। বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষ হযরত আবু রাফে (রা.) অবস্থার জটিলতা লক্ষ্য করে বললেন, হুজুর! আমি নিজেই তাকে মুক্তাটি দিয়েছিলাম। এতে কোনোক্রমে তাঁর মেয়ে রক্ষা পেলেন।

নিজের কাজ নিজ হাতে করা:

তিনি নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য কারো কাছে সাহায্য নেওয়া পছন্দ করতেন না। একদা তিনি কিছু খেজুর ক্রয় করেছেন । তা খুব ভারী ছিল। তিনি নিজেই তা বহন করে চলছেন। লোকজন দেখে আরজ করলেন, আপনি কেন কষ্ট করছেন? আমাদেরকে দিন। আমরা নিয়ে যাই। তিনি বললেন না ابو العيال احق بحمله ঘর ওয়ালাই তা বহন করার অগ্রাধিকার রাখে।

ন্যায় বিচার :

তিনি ন্যায় বিচারে কোনো ধরনের শিথিলতা করতেন না। মুমিন কাফির, দোস্ত, দুশমন সবার ব্যাপারে ন্যায় বিচার করাকে তিনি পছন্দ করতেন। একদা তাঁর জেরা (যুদ্ধের পোশাক) কোথাও পড়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে তা এক ইহুদীর হস্তগত হয়। তিনি খবর পেয়ে কাজীর আদালতে আপিল করলেন। সাক্ষী পেশ করলেন তাঁর পুত্র হযরত হুসাইন (রা.) এবং গোলাম কুম্বরকে। কাজী পুত্রের সাক্ষী গ্রহণ করলেন না। এতে তাঁর দাবী সাব্যস্ত না হওয়ায় তা খারেজ করে দিলেন। তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়া সত্ত্বেও কাজীর ফায়সালা নির্বিঘ্নে মেনে নিলেন। এ অবস্থা দেখে ইহুদী খুবই প্রভাবিত হলো এবং বলল: নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্ম সত্য। একথা বলে সেও ইসলাম গ্রহণ করলো এবং স্বীকার করলো যে, জেরাটি হযরত আলীর।

শাহাদাত : অবশেষে ২০ রমাজান ৪০ হিজরী জুম'আর রাতে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম নামক এক কুখ্যাত খারেজী হযরত আলী (রা.) এর উপর ফজরের নামাযের ইমামতী করার সময় তরবারী দ্বারা আঘাত করে। এরপর প্রয়োজনীয় অসিয়ত করার পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হযরত হাসান (রা.) জানাযার ইমামত করেন এবং কূফার একটি কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএল-এ পাঠানো হয়।
*	জেলা ভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২০% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যে কোন সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	২০০	৩০০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৭২০	৯০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১০৮০	১২০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১২০০	১৪০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৫০০	১৭০০
#	আমেরিকা	১৭০০	২০০০

১বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনি অর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

সম্মানিত গ্রাহকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, রেজিস্ট্রি ডাকই সকল গ্রাহকের জন্য উত্তম। কারণ সাধারণ ডাকে অনেক সময় ঠিকমত পত্রিকা পৌঁছে না।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : কুইজ প্রতিযোগিতা

ওলিউর রহমান
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসাঃ

আমাদের এলাকায় বিভিন্ন সংগঠন শিক্ষার্থীদের মাঝে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এতে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রশ্ন ছাপিয়ে ফরম আকারে বিক্রি করে থাকে এবং উত্তর দাতাদেরকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরষ্কার দেওয়া হয়। পুরষ্কারের জিনিস ক্রয় করা হয় ফরমের টাকা থেকে। আমার প্রশ্ন হলো এ ধরনের কুইজ প্রতিযোগিতা জায়েয কি না। যদি না জায়েয হয় তাহলে এর জায়েয পদ্ধতি কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কুইজ প্রতিযোগিতা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় না জায়েয। তবে যদি প্রতিযোগীদের কাছ থেকে ফরমের টাকা না নেওয়া হয় এবং উক্ত প্রতিযোগিতা বাস্তব জ্ঞান সম্মত বা কোনো দ্বীনি বিষয়ে হয় তাহলে তা জায়েয আছে। (সূরায়ে মায়েদা ৯০, রদ্দুল মুহতার ৬/৪০৩, ইমদাদুল আহকাম ৪/৩৭৭, আ-পকে মাসায়েল আওর উন্‌কা হল ৭/৩৩৫)

প্রসঙ্গ : আত্মহত্যাকারীর জানাযা

মুহাম্মদ মাসউদুল করীম
জগন্নাথপুর, বরুড়া, গোপালগঞ্জ,
টাঙ্গাইল।

জিজ্ঞাসা :

(১) যদি কোনো ব্যক্তি সামাজিক বিবাদ বা পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত কোনো কারণে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে স্বেচ্ছায় বিষ পান কিংবা গলায় ফাঁসী দিয়ে আত্মহত্যা করে তাহলে তার জানাযা পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

(২) কতিপয় লোক এদের জানাযা পড়ে না এবং অপরকেও পড়তে বাধা দেয়। এদের হুকুম কি?

সমাধান :

(১-২) আত্মহত্যা অত্যন্ত জঘণ্যতম অপরাধ তথা গোনাহে কবীরা। গোনাহগার মুসলমানের জানাযা পড়তে হয়। যেহেতু আত্মহত্যাকারীও অন্যান্য গোনাহগার মুসলমানের মতই একজন গোনাহগার মুসলমান তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে তার জানাযা পড়াও ফরজে কেফায়া। সুতরাং আত্মহত্যাকারীর জানাযায় শরীক হতে কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না। তবে দেশের বিশিষ্ট আলেমগণ স্বেচ্ছায় শরীক না হওয়া ভাল। যাতে এ ধরনের অপকর্মের বিকাশ না ঘটে। (রদ্দুল মুহতার ২/২১১, ফতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৬৩, আহসানুল ফতাওয়া ৪/২০৬)

প্রসঙ্গ : সমস্ত মুমিনের প্রতি ঈসালে ছওয়াবের মাধ্যমে দু'আ করা

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
তাসাই বেলকাঠি
সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমরা কিছু সংখ্যক আলেম-উলামা ও ইমাম মুআযযিনকে বিভিন্ন দু'আর অনুষ্ঠানে এভাবে দু'আ করতে শুনি। প্রথমে কিছু দু'আ-দরূদ ও তাসবীহ তাহলীল পড়ে এর ছওয়াব বাবা আদম (আ.) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমস্ত নবী রাসূল ও মুমিন মুমিনাতের রূহের উপর পৌঁছিয়ে থাকেন। অতঃপর অন্যসব দু'আ করেন। এখন আমার প্রশ্ন হলো এভাবে দু'আ করা সোনালী যুগে ছিল কি না? এবং এভাবে দু'আ করার শরয়ী বিধান কি?

সমাধান :

কুরআন-সুন্নাহের আলোকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সমস্ত মুমিন মুমিনাতের রূহের মাগফিরাতের জন্য ঈসালে ছাওয়াব করে দু'আ করার প্রথা ইসলামের সোনালী যুগেও ছিল। তাই এভাবে দু'আ করা শরীয়ত পরিপন্থী নয়। (সূরা ইবরাহীম আয়াত ৪১, মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ৪৩০, রদ্দুল মুহতার ৩/১৫১)

প্রসঙ্গ : নাবালকের সহশিক্ষা

মুহাম্মদ মিযানুর রহমান
৬/৪এ বাইশটেকী, মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

নাবালক শিক্ষার্থীদের জন্য সহশিক্ষা বৈধ আছে কি না? বিশেষ করে সাত বছরের নীচের ছেলে মেয়ে এক সাথে মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা তা'লিম দেওয়া জায়েয আছে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে উল্লেখিত বয়সের নাবালক ছেলে-মেয়েদের একত্রে মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা তা'লিম দেওয়া বৈধ হবে। তবে বালক-বালিকাদের জন্য ভিন্নভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা করা সর্বাবস্থায় উত্তম। (সূরায়ে নূর আয়াত ৩১, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৬/৪০৫)

প্রসঙ্গ : ঈদের খোতবার সময় মুক্তাদীদের তাকবীর বলা

মুহাম্মদ আব্দুস সুবহান
পরশুরাম, ফেনী।

জিজ্ঞাসা :

ইমাম সাহেব ঈদের খোতবা দান কালে

তাকবীরে তাশরীক বা দরূদ শরীফ পাঠকালে মুসল্লীরা তার সাথে তা পড়ার হুকুম কি?

সমাধান :

ইমাম সাহেব খোতবা দেওয়া অবস্থায় তাকবীরে তাশরীক বা দরূদ শরীফ পাঠ করলে মুসল্লীগণ তার সাথে মনে মনে পড়তে পারবে। মুখে উচ্চারণ করে পড়া নিষেধ। (দুররে মুখতার ২/১৫৯, বাদায়েউস সানায়ে ২/১৯৮, ফাতহুল কৃদীর ২/৩৮)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহাম্মদ উমর খোন্দকার
ডুলাহাজারা, , চকরিয়া,
কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক লোক সালাতুত্তাসবীহর নামায আদায় কালে তন্মধ্যে যে নির্দিষ্ট তাসবীহসমূহ আছে ওই তাসবীহগুলো স্বশব্দে পড়ল। এখন আমার প্রশ্ন হলো ওই ব্যক্তির নামায আদায় হবে কি না। যদি হয় তার সিজদা সহু দিতে হবে কি না? আর যদি আদায় না হয় তবে কি করতে হবে?

সমাধান :

নামাযের মধ্যে তাসবীহ নিঃসন্দে পড়া সুন্নাত। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির নামায আদায় হয়ে যাবে। সাহু সিজদা দিতে হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৮০, বাদায়েউস সানায়ে' ১/৬৯১, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৩/২৩)

প্রসঙ্গ : আরফার দিনের রোযা

হাসান বিন যাইনুল আবেদীন
লক্ষীপুর।

জিজ্ঞাসা :

হাদীস শরীফে আরফার দিনের রোযার অনেক গুরুত্ব ও ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। আমরা দীর্ঘ দিন থেকে জেনে আসছি যে, আরফার দিনের রোযা বলতে ৯ই জিলহজ্বের রোযাকে বুঝায়। কিন্তু এই বছর জনৈক আলেমের মুখে শোনা গিয়েছে- আরফার দিনের রোযা বলতে (বাংলাদেশ হিসেবে) ৮ই জিলহজ্বের রোযাকে বুঝায়। উক্ত আলেমের দলীল হল :

(ক) হাদীসে يوم عرفه তথা 'আরফার দিন' বলা হয়েছে। আর সৌদি আরবে যে দিন আরফার দিন হয় ওই দিন আমাদের দেশে ৮ তারিখ হয়। (খ) আরাফার দিনের রোযার এত ফজীলত এসেছে আরাফার দিনকে কেন্দ্র করে। আর আরাফার দিন আমাদের দেশ হিসেবে ৯ তারিখে নয় বরং ৮ তারিখে। তাই ৮ তারিখে রোযা রাখতে হবে।

এখন আমার প্রশ্ন হলো এক. আরাফার দিনের রোযা বলতে ৯ই জিলহজ্বের রোযা বোঝায় না কি ৮ তারিখ, বা সৌদি আরবে আরাফার দিনের রোযাকে বুঝায়? দুই. যদি ৯ই জিলহজ্বের রোযাকে বোঝায় তাহলে প্রশ্নে বর্ণিত আলেমের উক্তিগুলোর জবাব কি? এর সমাধান জানিয়ে উপকৃত করবেন।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত আলেমের ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ হাদীস শরীফে আরাফার দিন বলে ৯ই জিলহজ্বের দিন বুঝানো হয়েছে। অতএব সকল দেশের অধিবাসীগণ নিজ নিজ দেশের তারিখ মোতাবেক জিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখে আরাফার রোযা রাখবে। তথা যে দেশে যখন ৯ই জিলহজ্বের দিন আসবে সেদেশের অধিবাসীগণ তখনই আরাফার দিনের রোযা রাখবে। যেমন অন্যান্য এবাদত নামায, রোযা, ঈদ, কুরবানী এবং শবে বরাত বিশ্বের সমস্ত মুসলমান আপন আপন দেশের তারিখ ও সময় অনুযায়ী আদায় করে থাকে। সৌদি আরবের তারিখ অনুযায়ী এবাদত বন্দেগী করার কথা কোরআন ও হাদীস শরীফের কোথাও বলা হয় নি। তাই নিজ দেশে চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করেই সকল ইবাদাতের মত ৯ই জিলহজ্ব তথা আরফার দিন রোযা রাখতে হবে।

فائدة : فى مناسك النووى يوم التروية هو الثامن واليوم التاسع عرفة العاشر النحر (رد المحتار ٢/٥٠٣)

(তিরমিযী ১/১৫৭, কানযুল উম্মাল ৮/৫৭৯, ফতাওয়ায়ে শামী ২/৫০৩, ইমদাদুল ফতাওয়া ৬/১২৯)

প্রসঙ্গ : বদলী হজ্ব

আলহাজ্ব আশরাফ মিয়া
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

বিনীত নিবেদন এই যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তি বদলী হজ্ব করলে তার ফজীলত কি? এবং বদলী হজ্ব করার শর্ত কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

মৃত ব্যক্তির পক্ষে তার অসিয়তের ভিত্তিতে বদলী হজ্ব করলে তার রেখে যাওয়া এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে হজ্ব করবে। তাতে মৃত ব্যক্তি ও বদলী হজ্বকারী উভয়ে ছওয়াবের অধিকারী হবে এবং মৃত ব্যক্তির ফরজ হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

অসিয়ত না করা অবস্থায় তার মাল হতে হজ্ব করার অনুমতি নেই। বরং তার মাল ওয়ারিসদের মধ্যে শরীয়ত মতে বন্টন হবে। যে কোনো ওয়ারিস বা ব্যক্তি নিজ মাল দ্বারা মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব আদায় করলে মৃত ব্যক্তির ফরজ হজ্ব আদায় হয়ে যাওয়ার আশা করা যায়। অনুরূপ যদি ওয়ারিশগণ সকলে প্রাপ্ত বয়স্ক হয় এবং সম্মতি দেয় তবে মৃতের মাল থেকেও বদলী হজ্ব করানো যাবে। এতে বদলী হজ্বকারীও ছওয়াবের ভাগী হবে। (শামী ২/৬০০, ফতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২৫৮, ইমদাদুল আহকাম ২/১৮৮)

প্রসঙ্গ : হজ্ব

মুহাম্মদ আইয়ূব আলী

পীরগঞ্জ, রংপুর।

জিজ্ঞাসা :

(১) ১০, ১১, ১২ জিলহজ্ব তারিখে কঙ্কর মারার সময় কখন? অনেকে ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য ঢলার পূর্বেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে বলেন। ওই সময় কঙ্কর মারলে তা সঠিক হবে কি না?

(২) কোন ধরনের মা'জুর বা অপারগ হলে বা কোন ধরনের লোকের পক্ষ থেকে বদলী কঙ্কর মারা জায়েয হবে?

সমাধান :

এক. ১০ই জিলহজ্ব কঙ্কর মারার সময় হল সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে ১১ তারিখ সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত এবং ১১, ১২ তারিখে কঙ্কর মারার সময় হলো সূর্য ঢলার পর থেকে পরের দিন সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত। যারা ১১, ১২ তারিখে সূর্য ঢলার পূর্বেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে বলেন তা সঠিক নয়। উক্ত সময় কঙ্কর মারলে তা আদায় হবে না। (আদদুররুল মুখতার ২/৫২১, রাদ্দুল মুহতার ২/৫২১, আলবাহরুররায়েক ২/৩৪৮)

দুই. যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম অথবা সে নিজ শক্তিতে জামারাত (পাথর মারার স্থান) পর্যন্ত যেতে অক্ষম এবং তার কোনো সাহায্যকারীও নেই এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী কঙ্কর মারা বৈধ হবে। (গুনইয়াতুল মানাসিক ১০০, ফতাওয়ায়ে রহীমিয়্যা ৫/৩৩৫, খায়রুল ফতাওয়া ৪/৩৩৫)

প্রসঙ্গ : কুরবানী

মুহাম্মদ

পেকুয়া, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

যদি দু'জন ব্যক্তি একটি ছাগল দ্বারা নফল কুরবানী করে তাহলে তার হুকুম কী?

সমাধান :

দু'জন ব্যক্তি একটি ছাগল দ্বারা কুরবানী করলে (চাই সেটা নফল হোক বা ওয়াজিব হোক) তাদের কুরবানী সহীহ হবে না। তবে সেই গোশত নিজেও খেতে পারবে অন্যকেও খাওয়াতে পারবে।

কুরবানী সহীহ না হওয়ার কারণ হলো কুরবানীর ক্ষেত্রে একই ছাগলে শিরকত বা অংশীদারিত্ব জায়েয নেই। (হাশিয়াতু ত্বাহতাবী ৪/১৬১, ফতাওয়ায়ে ক্বাজীখান ৪/৩৩১, ফতাওয়ায়ে সিরাজিয়্যা ৮৯, ফতাওয়ায়ে রাহীমিয়্যা ৩/১৮৫)

প্রসঙ্গ : কুরবানী

মুহাম্মদ সানাউল্লাহ নিয়ামতী

জিজ্ঞাসা :

গ্রাম গঞ্জে সামাজিক কাঠামো অত্যন্ত মজবুত, সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো কাজ করা মোটেও সম্ভব হয় না। সমাজ পতিরা নিয়ম চালু করেছেন, কুরবানী দাতাদের তিনভাগের একটি ভাগ সমাজ পতিদের নিকট জমা দিতে হবে। নতুবা তারা নানাভাবে তিরস্কার ও ধিক্কার দিয়ে থাকে। এমনকি সমাজ থেকেও বের করে দেয়। বাধ্য হয়ে তাদের নিকট কুরবানীর একটি অংশ দিতে হয়। তারা সমস্ত কুরবানী দাতার অংশগুলো নিয়ে সমাজের ধনী গরীব কুরবানী দাতাসহ সবাইকে মাথা পিছু বন্টন করে দেয়। প্রশ্ন হলো, সমাজপতিদের এভাবে বন্টন করা সহীহ হবে কি না? এবং কুরবানীর কোনো ক্ষতি হবে কি না? আর কুরবানী দাতারা উক্ত গোশত নিতে পারবে কি না? কেননা তার গোশতও সেখানে মিশানো হয়েছে। অনেকে দান করে ফেরৎ নেওয়ার হাদীস দ্বারা গোশত নেওয়া নিষেধ করেন। এই নিষেধ করা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

কুরবানীর গোশতের ব্যাপারে শরীয়ত কুরবানী দাতাকে এখতিয়ার দিয়েছে। চাইলে পুরোটাই রাখতে পারে আবার সবটা সদকা করে দিতে পারে। আর তিনভাগ করে একভাগ নিজের জন্য রাখা, এক ভাগ গরীবদের দেওয়া আর একভাগ আত্মীয়স্বজনদের দেওয়া উত্তম। এটা আবশ্যক কোনো বিধান নয়। কাজেই সমাজপতি কর্তৃক চাপ সৃষ্টি করা শরীয়ত কর্তৃক ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরন করার নামান্তর। আর হাদীস শরীফে আছে অন্যের মাল তার সন্তুষ্টি ছাড়া হালাল নয়। কাজেই চাপ সৃষ্টি করে কুরবানীর একটি অংশ দিতে বাধ্য করার সামাজিক প্রথাটি পরিহারযোগ্য। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৭, মুসনাদে আহমদ ৫/৭২)

প্রসঙ্গ : আক্বীকা

মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম

সাভার, নান্দাইল,

মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা :

দুই ভাই। এক জনের দুই মেয়ে এক ছেলে। আর অন্য জনের দুই ছেলে। এখন উভয়ের সন্তানাদীর আকীকা একটি গরুতে করতে চায়। জানার বিষয় হলো উক্ত পদ্ধতি শরীয়ত সম্মত কি না?

সমাধানঃ

গরুর অংশ দিয়ে আক্বীকা করার ক্ষেত্রে যদিও ছেলের পক্ষ থেকে দুই অংশ দেয়া উত্তম তবে এক অংশ দিয়েও সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। তাই আপনাদের পাঁচ সন্তানের আক্বীকা একটি গরু দিয়ে আদায় করলে সহীহ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বরাবর পাঁচ ভাগে টাকা জমা করতে পারেন। অথবা যে কোনো দুই ছেলের প্রতি জনের জন্য দুই অংশ করে ও বাকীদের এক অংশ করে মোট সাতভাগে টাকা জমা করতে পারেন। (শামী ৬/৩৩৬, ফতওয়ায়ে রহীমিয়্যা ২/৯৪)

প্রসঙ্গ : তাবলীগী জমা'আতের মসজিদে ঘুমানো ও খাওয়া দাওয়া

মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমরা জানি দাওয়াত ও তাবলীগ ভাল কাজ। কিন্তু আমাদের এলাকায় এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যে, তাবলীগ জামা'আত মসজিদে ঘুমাতে পারবে কি না? এখন আমার জানার বিষয় হলো তাবলীগ জামা'আতের মসজিদে ঘুমানো জায়েয আছে কি না? এবং কুরআন ও হাদীসে তার কোনো প্রমাণ আছে কি না?

সমাধান :

শরয়ী দৃষ্টিকোনে মুসাফির, ইলম ও দ্বীনি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা, খাওয়া দাওয়া ও ঘুমানো জায়েয ও বৈধ বলে বিবেচিত। তবে বাড়ি ঘরের মত সেখানে বসবাস ও খানাপিনা করা যাবে না। তাবলীগী জমা'আতের লোকেরা সাধারণত মুসাফির হয়ে থাকেন। উপরন্তু তাঁরা দ্বীনি কাজে নিয়োজিত আছেন, তথাপি ই'তিকাফের নিয়তে তাঁরা মসজিদে অবস্থান করে থাকেন। সুতরাং তাঁদের জন্য মসজিদে অবস্থান, রাত্রি যাপন, খাওয়া-দাওয়া জায়েয হওয়াতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে মসজিদে অবস্থান কালে খাওয়া দাওয়া ও ঘুমানোর ক্ষেত্রে মসজিদের আদব ইহতিরামের প্রতি পরিপূর্ণ খেয়াল রাখা জরুরী। (দুররে মুখতার ১/৬৬১, ফতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩২১, ফতাওয়ায়ে রহীমিয়্যা ৬/১২১)

প্রসঙ্গ : মীলাদ ও কিয়াম

মুহাম্মদ খুরশিদ আলম
৯/১ পল্লবী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা:

মীলাদ কাকে বলে? সমাজে প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? মীলাদ দাঁড়িয়ে পড়া আর বসে পড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না?

সমাধান :

শরীয়তের পরিভাষায় মীলাদ বলতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনাকে বোঝায়। যা অত্যন্ত মোবারক ও পূণ্যময় কাজ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত মীলাদ মাহফিল বলতে ওই সব অনুষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে বিশেষ পদ্ধতিতে দরূদ শরীফ পাঠ করাসহ কিয়াম করা হয়। আবার অনেক স্থানে এ সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে হাজির নাজির বলে আক্বীদা পোষণ করা হয়। ইসলামের স্বর্ণযুগে এধরনের মিলাদ কিয়ামের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সর্ব প্রথম ৬৪০ হিজরীতে ইরাকের মুসেল শহরের বাদশা মুজাফফরুদ্দীন ইবনে আরবলের নির্দেশে এই মীলাদ মাহফিলের সূচনা হয়। তাই ইসলামের মাঝে নবাবিষ্কৃত এ ধরনের মীলাদ কিয়াম সম্পূর্ণ পরিহারযোগ্য। (বুখারী শরীফ ১/৩৭১, রাহে সুন্নাত ১৬২, ফতাওয়ায়ে রশীদিয়া ১১৪)

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপ্টিক্যাল কো.

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারী ও খুচরা দেশী বিদেশী চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা, ১২১৫
ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

উদীয়মান কাফেলা

অর্থসম্পদ সৎপথে ব্যয় ও অপব্যয়

والـذيـن صبـروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الـصـلـوة وانـفـقـوا ممـا رزقنـاهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السئية اولئك لهم عقبى الدار۔

"যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভুত করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম রয়েছে।" (সূরা রাদ ২২)

আলোচ্য আয়াতে ব্যয়কে সৎ লোকদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যয় সম্পর্কে পূর্বেও অনেক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামে ব্যয়ের প্রথম মূলনীতিই হল তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। অবশ্য ইসলামে সব ভালো কাজই এই উদ্দেশ্যে করতে হয়।

ইসলামে ব্যয়ের অন্যান্য মূলনীতি কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও অপচয়কে নিন্দা করেছে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে –

ولا تبـذروا تبـذيـرا ان الـمبـذرين كانوا اخـوان الشيـاطيـن وكـان الشيـطن لربه كفورا۔

"এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না। বস্তুত যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাইল ২৬-২৭)

এ ব্যয় করতে হবে অতিরিক্ত সম্পদ থেকে, যা প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে–

ويسئلون ماذا ينفقون قل العفو

''আর তারা তোমার নিকট কি খরচ করবে তা জিজ্ঞেস করে। তুমি বল যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।" (বাকারা ২১৯)

এ ব্যয় করতে হবে আল্লাহর পথে। ব্যবসা বানিজ্যেও তা ব্যয় করা যাবে। কেননা ব্যবসা বানিজ্য হালাল। আত্মীয় স্বজন এবং দরিদ্র জনগণের জন্যও ব্যয় করতে হবে। আলোচ্য আয়াতে মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করাকে মু'মিনের গুণ বলা হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ কথার ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে।

যেমন কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يبنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكـلـواواشـربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين۔

অর্থাৎ হে বনী আদম! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছেদ পরিধান কর। খাও এবং পান কর। কিন্তু অপব্যয় করো না। আল্লাহ অপব্যয়ীকে পছন্দ করেন না। (সূরা আল আরাফ ৩১)

আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) লিখেছেন– পৃথিবীতে বেশী সম্পদ ও অর্থ হওয়া সৌভাগ্য বা দূর্ভাগ্যের ব্যাপার নির্ধারণ করে না। এটা সব সময় সত্য নয় যে, যাদের বেশী ধনসম্পদ আছে তারা আল্লাহর অধিক প্রিয়। আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা দারিদ্র জীবন কাটায়। অন্যদিকে অনেক অপরাধী লোক আরাম আয়েশে দুনিয়ায় থাকে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম ও বিধান। সুনিশ্চিতভাবে আর একটি জগত আছে যেখানে ভাল মন্দ কাজের ফল পাওয়া যাবে।

আয়াত নাযিলের প্রেক্ষিত :

তদানীন্তন জাহেলী যুগে আরবের পুরুষরা দিনে ও নারীরা রাতের বেলায় উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতো। তারা বলতো যে পোশাকে আমরা গোনাহ করেছি সে পোশাকে আমরা তাওয়াফ করব না। আবার কেউ কেউ বলতো এ কাজ আমরা শুভ বিবেচনা করে থাকি অর্থাৎ যেমন আমরা কাপড় শূন্য তেমনি আমরা পাপশূন্য হয়ে যাবো।

হজ্বের সময় তারা হজ্বের সম্মানার্থে শুধু প্রাণে বাঁচার জন্য সামান্য আহার করতো, চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করত। এসব দেখে মুসলমানরা বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মুসলমান, আমরাই তো এর ধরনের পদ্ধতি পালনের বেশী হকদার। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু নীতি ও শিক্ষা এ আয়াত কটিতে বলা হয়েছে। ৩১ নং আয়াতে ইসলাম ভোগ এর নীতি ও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ আয়াতে পোশাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, খাওয়া ও পান করাকে কেবল হালালই করা হয়নি বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট প্রমান হয় যে, ইসলামে বৈরাগ্যবাদ বা জীবন বিমুখতার কোনো স্থান নেই। এ নীতির ফলে ইসলামী সমাজে উৎপাদন, ব্যবসা, বানিজ্য ও আল্লাহর নির্দেশাবলীর সীমার মধ্যে থেকে অনন্দময় ভোগ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অবশ্যই ভোগ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসরাফ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসরাফ বলতে মুফাসসিরগণ বলেছেন, হারাম খাওয়া এবং অতিরিক্ত পানাহার করা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পার্যায়ে ইসরাফ না করার নীতির ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে। ব্যক্তি পর্যায়ে এটি একটি নৈতিক নীতি হিসেবে কাজ করবে। কুরআন মজীদে বৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থসম্পদ অবৈধ কাজে উড়িয়ে দেওয়া, কিংবা বিলাসিতা, আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ উপভোগে ব্যয় করা এবং দিন দৈনন্দিন জীবন যাপনের মান বাড়ানোর একমাত্র উদ্দেশ্যে বল্গাহীনভাবে অর্থ ব্যয় করাকে তীব্র ভাবে নিন্দা করা হয়েছে।

ولا تبـذروا تبـذيـرا ان الـمبـذرين كانوا اخـوان الشيـطيـن، وكـان الشيطن لربه كفورا۔

"অপব্যয় করো না। অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার মনিবের অকৃতজ্ঞ। (সূরা বনী ইসরাইল ২৬-২৭)

কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের সঠিক কর্মনীতি হলো, সে নিজের জন্য এবং নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। তার অর্থ সম্পদের উপর তার নিজের এবং তার সাথে যারা সম্পর্কিত তাদের অধিকার রয়েছে। এই অধিকার প্রদান করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা যাবে না।

কিন্তু তাই বলে আবার কেবল এই এক অধিকার প্রদান করতেই অন্যান্যদের বঞ্চিত করে সব অর্থ সম্পদ উজাড় করে দেওয়াও যাবে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে –

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حسورا۔

"আর নিজের হাতকে (কৃপনতা করে) গলায় বেঁধে রেখোনা। আবার সম্পূর্ণ প্রসারিতও করে দিওনা। এমনটি করলে তোমরা তিরস্কৃত হবে এবং খালি হাতে বসে পড়বে। (সূরা ইসরাঈল ২৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তোমাকে যে অর্থ সম্পদ দান করেছেন, তার মাধ্যমে পরকালের ঘর অন্বেষণ কর। তবে তোমরা পার্থিব অংশের কথাও ভুলে যেওনা। আর আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন (অর্থ সম্পদ দ্বারা) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করো না। (আল কাসাস৭৭)

অর্থ ব্যয়ের সঠিক খাত :

যুক্তিসংগত সীমার মধ্য থেকে নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর বৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থসম্পদের যে অংশ হাতে অবশিষ্ট থাকবে তা যেসব খাতে ব্যয় করা উচিত সেগুলো হলো :

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– "তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরালে তা কিন্তু প্রকৃত পূণ্যের কাজ নয়। বরং প্রকৃত নেক কাজ হলো মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি, আর কিতাবের প্রতি, নবীদের প্রতি, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় অর্থসম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়দের জন্য, এতীমদের জন্য মিসকীনদের ও পথিকদের জন্য, সাহায্য প্রার্থীদের জন্য এবং মানুষকে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার জন্য। (আল বাকারা ১৭৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন:

"(আর সৎলোকেরা) আল্লাহর ভালবাসার খাবার খাওয়ায় মিসকীন, এতীম এবং বন্দীদের, আর বলে আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই তোমাদের আহার করাচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা লাভের আমরা আকাঙ্ক্ষী নই। (আদ্দাহার ৮৯)

ব্যয়ের যেসব পন্থা বা পদ্ধতি নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করে কিংবা যেগুলোর দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইসলামে তা সবই নিষিদ্ধ। মদ্যপান ও ব্যভিচার ইসলামে নেই। গান, বাদ্য, নৃত্য এবং বাজে আনন্দ বিহার প্রভৃতিতে কেউ নিজের অর্থকড়ি খরচ করতে পারে না। কোনো পুরুষ রেশমের পোশাক এবং সোনার অলংকার ব্যবহার করতে পারে না।

মোটকথা, ইসলাম ব্যয়ের এমন সব দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ তার প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার কাজে অর্থ ব্যয় করে। অন্যদিকে ইসলাম অর্থ ব্যয়ের সেইসব পন্থা ও পদ্ধতিকে বৈধ রেখেছে, যার দ্বারা মানুষ মধ্যম ধরনের পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে পারে। যারা অর্থসম্পদ সঞ্চয় ও মওজুদ করে পুঞ্জিভূত করে রাখার চেষ্টা করে সমাজে তাদের কোনো মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হয় না।

মুহাম্মদ জাফর হাতিয়াভী

তারানা

কাবার পথে

মুহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান বগুড়বী

দলে দলে মানুষ চড়ে
বিমানে বা জাহাজে
কোথায় তারা কত দূরে
যাচ্ছে অমন করে!

কিসের টানে কোন আঘ্রাণে
সেই সে অচিন পুরে
বাড়ি-গাড়ি সবই রেখে
যায় সে অনেক দূরে

মন যে শুধু ছটফট করে
যেতে তোমার পানে
তুমি দেখা দাওনা মোরে
আধার ঘুমের ঘুরে।

ওগো বাতাস আমায় তুমি
নাওনা তোমার সাথে
যেথায় আছে প্রিয় নবী
ওই যে, কাবা ঘরে

ওগো পাখি আমায় তুমি
দাওনা ডানা মেলে
যাব আমি মাহবুব পানে
তোমার ডানায় করে।

বাতাস সে তো যায় গো চলে
প্রিয় নবীর দেশে
একা একা যায় সে চলে
নেয় না আমায় সাথে।

পাখিও আমায় নেয় না সাথে
মন যে আমার কাঁদে
ব্যথার সাগর মনেই থাকে
কেউ তো নাহি বোঝে।

ওহে প্রভূ তোমার তরে
যাচি পরিশেষে
হৃদয় আগুন দাও নিভিয়ে
হজ্জে কাবায় নিয়ে।

মতের জোয়ার

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়

ইলম উঠে যাচ্ছে- দায়ী কারা?

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের থেকে হঠাৎ করে ইলমকে টেনে নিয়ে যাবেন না। বরং ইলম উঠিয়ে নিবেন উলামাদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। এক পর্যায়ে একজন হক্কানী আলেমও বাকী থাকবে না। তখন লোকেরা মূর্খ নেতাদেরকে (তাদের মুফতী হিসেবে) গ্রহণ করবে। অত:পর তারা ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞাসিত হলে অজ্ঞতা সত্বেও ফতওয়া দিবে। এতে করে তারা নিজেরা গোমরাহ হবে এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ১০০)

২. বুখারী শরীফের কয়েক স্থানে এসেছে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, يرفع العلم يثبت الجهل (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৮০) অর্থাৎ কিয়ামতের একটি আলামত হল ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং লোকদের মধ্যে মুর্খতা বৃদ্ধি পাবে।

يرفع العلم এর বিষয়টিতে উলামায়ে কেরাম জড়িত। কারণ ইলমের হেফাজত এবং ইশাআত মূলত তাদেরই দায়িত্ব। সুতরাং তাদের দূরদর্শিতার অভাবে বা গলত সিদ্ধান্তের কারণে বা ইলমের উপর কোনো হামলা আসলে তা প্রতিহত না করার কারণে ইলম দুনিয়া থেকে উঠে যেতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত ইলম বিদায় নিয়ে মদীনা শরীফে চলে যাবে এবং সেখান থেকে কোনো এক সময় সম্পূর্ণভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে।

এখন দ্বীনের ধারক বাহক উলামায়ে কেরামদের চিন্তাভাবনা করতে হবে যে, আমাদের দ্বারা ইলম উঠে যাওয়ার মত কোনো পদক্ষেপ বা কর্মকাণ্ড ঘটছে কি না? উলামাদের চিন্তাভাবনার জন্য আমি আমার ধারণা মতে কয়েকটি বিষয় উলামা-তুলাবাদের খিদমতে পেশ করছি। আমার কথার সাথে আপনারা যদি একমত হন তাহলে এগুলোর ব্যাপারে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এর থেকে জানপ্রাণ দিয়ে বেঁচে ইলম বাকী রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এক. শর্ট কোর্স/মাদানী নেসাব :

এটা কিছু ভাই শুরু করেছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের জন্য, তারা যেন ৫/৬ বছর মেহনত করে নিজে কুরআন বুঝার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ব্যাপারটা এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলে আপত্তি হতো না, কিন্তু এখন সমাজের হাজারো কম বয়সের ছাত্ররা শর্ট টাইমে মাওলানা হওয়ার জন্য এখানে পড়াশুনা করছে। যাদের দেওবন্দী নেসাবে পড়াশুনা করতে কোনো অসুবিধা ছিল না। তাদের জন্য এই শর্টকোর্স দশ দিক থেকে رفع علم এর সাথে সম্পৃক্ত।

১. ইলমে তাফসীরের জন্য যে ১৫ প্রকার ইলমের প্রয়োজন- ইতকান ২-৪৬৪ (দারুল হাদীস কায়রু) দেওবন্দী নেসাবে এগুলো দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়ানো হয় এবং এ ১৫টা বিষয়ে ছাত্রদেরকে পারদর্শী করে গড়ে তোলা হয়।

পক্ষান্তরে শর্টকোর্সের সময় কম হওয়াতে অনেক জরুরী কিতাব বাদ দেওয়ায় এ পনেরো ইলমের অনেক গুলো বাদ পড়ে যায়। যার দরুন বড় বড় তাফসীর এর কিতাব থেকে ফায়দা হাসিল করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। যা ছিল ইলমের মূল লক্ষ্য বা মাকসাদ।

২. শরহে জামি, কানয ও মানতেকের উল্লেখযোগ্য কিতাব সেখানে না থাকার কারণে কঠিন মাসআলা মাসাইল বোঝার যোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে না। এ অবস্থায় তারা ইমাম বুখারী (রহ.) এর ইস্তিম্বাতে মাসায়েল সঠিকভাবে বুঝতে পারছে না এবং ফতওয়ার কিতাব হল করার যোগ্যতা থেকেও মাহরুম থাকছে।

৩. ফার্সী ভাষায় লিখিত আকাবিরদের উলূম ও মা'আরিফ (যেমন মা'আরেফে মাসনবী) ও বিভিন্ন ফুনুনাত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং রূহানিয়্যাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৪। অনুরূপ নিকট অতীতের দেওবন্দী আকাবিরদের অধিকাংশ উলূম ও মা'আরেফ উর্দূ ভাষায় যা ইলমের শুধু ভাণ্ডার নয় সমুদ্রও বটে, শর্টকোর্সে উর্দূভাষায় দক্ষতা অর্জন না হওয়ার কারণে ইলমের এ ভাণ্ডার থেকে তারা ব্যাপক হারে বঞ্চিত হচ্ছে।

৫। শর্টকোর্সে পড়ুয়ারা উর্দূতে দক্ষতার অভাবে আমাদের দেশে আগমনকারী বুজুর্গানে দ্বীনের তাকরীর ও বয়ানাত বুঝতে পারে না। এমন কি অনেক মি'য়ারী মাদরাসা যেখানে উর্দূতে তাকরীর হয় সেসব মাদরাসা থেকে তারা ইস্তিফাদা হাসিল করতে পারছে না।

৬। দেওবন্দী নেসাবের মাদরাসার মধ্যে ছাত্রদের বহুমুখি যোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। দাওয়াত, তা'লীম, তাযকিয়ার যে কোনো লাইনে তারা খিদমাত আঞ্জাম দিতে পারে বা দিয়ে আসছে। কিন্তু শর্টকোর্সের মাধ্যমে বহুমুখী যোগ্যতা অর্জন না হওয়ার দরুন তারা দ্বীনের যাথাযথ খিদমাত আঞ্জাম দিতে পারে না এবং তারা সমাজের দ্বীনি চাহিদা পূরণ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে।

৭। শর্ট কোর্সের ছাত্ররা যদিও মিশকাত দাওরা কোনো নাম করা মাদরাসায় পড়ে কিন্তু ফারেগ হওয়ার পর যখন তাদেরকে পড়ানোর জন্য কোনো দেওবন্দী মাদরাসায় পাঠানো হয় তখন তারা বিভিন্ন কিতাব পড়া না থাকার দরুন সার্বিক খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে না বরং অনেক মি'য়ারী কিতাব তাদের পড়াতে দিলে বলে ওঠে, আমি এটা পড়ি নাই, ওটা পড়ি নাই সুতরাং এসব কিতাব আমাকে দিবেন না। এভাবে উজরখাহী করতে হয়।

৮. তার অযোগ্যতার দরুন যে বড় মাদরাসা থেকে সে ফারিগ হয়েছে সে মাদরাসার আসাতিজাও মাদরাসার বদনাম হয় যে, এ মাদরাসার ভাল ছাত্ররাও কিতাব পড়াতে অক্ষম। ত্রুটি করল একজন অথচ এর দায়ভার বহন করছে আরেক জন।

৯। শর্টকোর্সের এ মাদরাসাগুলো দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের নওজোয়ানরা এর পরিনাম না বুঝে শর্ট টাইম মওলানা হওয়ার জন্য তার দিকে ঝুকছে। এ অবস্থায় তাদের বদআসর দেওবন্দী নেসাবের মাদরাসাগুলোর উপর পড়ছে। যার পরিণতিতে দেওবন্দী নেসাবের মাদরাসাগুলো থেকে কঠিন কিতাবগুলো একেরপর এক বাদ যাচ্ছে। এবং কোথাও কাফিয়া শরহে জামিকে এক করার দরুন উভয়টার কোনটাই হচ্ছে না। শুধু নামকে ওয়াস্তে উভয় কিতাবকে সিলেবাসের মধ্যে দেখানো হচ্ছে। এর পরিণতি এই হবে যে, ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে দেওবন্দী নেসাবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে, সব মাদরাসাগুলো শর্টকোর্সে পরিণত হবে। তারপর এদেশ থেকে ইলম বিদায় নিবে।

১০। শটকোর্সে পড়ুয়াদের মধ্যে পর্যাপ্ত ইলমের অভাবে আমল এবং আদবের কমতিটি ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুন্নাত তরীকার ইবাদত বন্দেগী থেকে তারা মাহরুম থাকছে।

বিশেষভাবে লক্ষনীয় এই যে, এদের অধিকাংশ দুনিয়া প্রেমী হয়ে ওঠছে এবং কিছু কিছু আরবী সাহিত্য শিখে জ্ঞানের গভীরতা না থাকায় বিদেশে এসে বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী হয়ে যায়। আমাদের মত প্রবাসীরা এরূপ অনেকের অবস্থা সম্পর্ক অবগত আছি। অনেকে তো দেশেও বিভিন্ন বাতিল দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়।

বোর্ডে মেধা তালিকায় নাম আসাকে লক্ষ্য বানানো :

ছাত্রগণ সম্পূর্ণ কিতাব হল করার পর যদি মেধা তালিকায় স্থান পায় এবং তার মধ্যে বড়াই ভাব সৃষ্টি না হয়, তাহলে এর মধ্যে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যখন কোনো মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এটাকেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানাবে যে, যে কোনো মূল্যে আমাদের ছাত্রদের নাম মেধা তালিকায় আসতে হবে তাহলে আমাদের সুনাম হবে, মাদরাসার কালেকশন বাড়বে। তাদের এই ধরনের নিয়ত একতো রিয়া ও তাকাব্বুরের মধ্যে শামিল হয়ে গোনাহের কারণ হবে, অপর দিকে ছাত্রগণ সম্পূর্ণ কিতাব হল করার সময় নষ্ট মনে করে বাদ দিয়ে প্রশ্ন বা গাইড হল করার পিছনে লেগে যাবে। যার দ্বারা কিতাবী যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হবে।

শিক্ষকতার জীবনে সে অকৃতকার্য হবে। ছাত্রগণ তার নিকট কিতাব বুঝে না। সেও বুঝাতে পারে না। শেষে পড়ানো বাদ দিয়ে সে ইমামিত করে বা দুনিয়াবী অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করে। চিরতরে ইলমে দ্বীনের লাইন থেকে বঞ্চিত হয়।

দেওবন্দী মাদরাসার ছাত্রদের সুন্নাত মুতাবিক আমলের ব্যাপারে নেগরানী না হওয়াঃ

এটা বর্তমানে অনেক মাদরাসায় দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। এটাও ইলম ওঠে যাওয়ার একটি কারণ। কারণ আমল বিহীন শুধুই ইলম টিকে থাকতে পারে না। তাই যখন আমলের নেগরানী হবে না তখন ইলম ছাত্রদের দিলে টিকবে না।

বেআমল আলেম ও তালেবে ইলম দ্বারা কুরআন সুন্নাহ এর ইলম ধরে রাখা অসম্ভব। কারণ হাদীসে পাকে আলেমের সংজ্ঞা বয়ান করা হয়েছে যে, যারা নিজেদের ইলম মুতাবিক আমল করে। (মিশকাত হাদীস নং ২৬৬)

সুতরাং যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে না তাদের কিতাবী ইলম যত বেশি হোক না কেন শরীয়ত তাদেরকে আলেম হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। বিধর্মীদের কাছে আমাদের চেয়ে বেশি কিতাব ও মা'লুমাত আছে। কিন্তু এ আমল বিহীন জ্ঞান তাদের কোনো ফায়দা দেয় নি।

সুতরাং ইলম বাকী রাখতে হলে অবশ্যই আমাদের মাদরাসাগুলোকে সুন্নাতের মারকায বানাতে হবে। তাহলে আমরা ইলমে দ্বীনের হেফাজত করতে পারবো।

মাওলানা শরফুদ্দীন
ফাজেলঃ জামিয়া মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
বর্তমানে : মদীনাতুল মুনাওয়ারা, সৌদী আরব প্রবাসী।

যদি সফল হতে চাও

২০০৯ সালের ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী, রোজ শনি ও রবিবার। দিন দু'টি ছিল মারকাযুল ফিকরিল ইসলামীর ফারেগীনদের জন্য অত্যন্ত আনন্দময় সৌভাগ্য ও গৌরবের দিন। কারণ এই দুই দিন অনুষ্ঠিত হয় মারকাযের ২০ সালা দস্তার বন্দী মাহফিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন, পাকিস্তানের মুফতীয়ে আজম মুফতী রফী উসমানী, শায়খুল ইসলাম আল্লামা জাস্টিস তকী উসমানী, খতীবুল আসর আল্লামা শাহ আব্দুল মজীদ নদীম, ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল হক আজমী, হযরতুল আল্লাম যুবায়ের উসমানী সাহেবসহ দেশ বিদেশের খ্যাতনামা শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম। একই মঞ্চে এত নক্ষত্রের উপস্থিতি শুধু মারকাযের ফারেগীনদের জন্য নয় বরং সমগ্র বাংলাদেশের দ্বীনদার মুসলমানদের পরম কাঙ্খিত ও দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল। উক্ত দস্তারবন্দী মাহফিলে আল্লামা তাকী উসমানী (দা.বা.) এক পর্যায়ে বলেন, ইমাম মালেক (রহ.) যখন তাঁর বিখ্যাত অমর গ্রন্থ মুআত্তা লিপিবদ্ধ করেন তখন তাঁর সুনাম -সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা দূর দূরান্ত থেকে পঙ্গপালের ন্যায় তার দরসে আসতে থাকে এবং তাঁর ঐতিহাসিক আজিমুশ্বান শান-শওকত বিশিষ্ট, সুসজ্জিত ও পরিপাটি হাদীসের দরস থেকে সরাসরি হাদীসের অমীয় বাণী শুনতে থাকে। কিন্তু এক শ্রেণীর লোকেরা মুআত্তার আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষাপরায়ন হয়ে ওঠে। এবং اصح الكتب بعد كتاب الله المؤطا কিতাবুল্লাহর পর জমিনের বুকে সব চাইতে সহীহ কিতাব মুআত্তা (তখন পর্যন্ত বুখারী শরীফ রচিত হয় নি) এই উপাধি কিভাবে করায়ত্ব করা যায় তার জন্য ওঠে পড়ে লেগে যায়। এমনকি কিছু উলামায়ে কেরাম মুআত্তায়ে ইমাম মালেক এর মত হাদীস একত্রিত করে মুআত্তা নামে বাজারে ছেড়ে দেয়। যেমনটি আমাদের দেশে খুব দেখা যায় কোনো একটি ব্রান্ডের পণ্য প্রসিদ্ধি লাভ করলে তার নাম উনিশ বিশ করে লেভেল, এদিক সেদিক করে বাজারজাত করা হয়) ইমাম মালেক (রহ.) এর কিছু হিতাকাংখী বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলে ইমাম মালেক যা বলেছিলেন তা আমাদের সকলের হৃদয়পটে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা দরকার। আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, ইমাম মালেক সে দিন বলে ছিলেন, ماكان لله يبقى যা আল্লাহ তা'আলার জন্য হয় তাই কেবল বাকী থাকে। তাইতো দেখা যায় মুআত্তা ইবনু আবি যিব এর নাম নিশানা পর্যন্ত কেউ জানেনা। আর যেই ইমাম মালেক এর লেখা পড়া খালিস, বাহ্যিক কোনো টাকা ছিল না, ঘরের ছাদ ভেঙ্গে লাকড়ী নিয়ে প্রয়োজন নির্বাহ করতে হতো সেই ইমাম মালেকের ইখলাস ও সুন্দর নিয়ত থাকার কারণে রাসূলেরপ্রতি অত্যাধিক মহব্বত থাকার কারণে যে মহব্বত তাকে অসুস্থতা ও বার্ধক্য সত্বেও মদীনার মাটিতে সওয়ারিতে আরোহন করতে বিরত রাখে, মদীনার জমিনে ইস্তিঞ্জা করতে বিরত রাখে, সেই ইমাম মালেকের মুআত্তাকে আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের ইলম পিপাসুদের জন্য অমূল্য গ্রন্থ হিসেবে বাকী রেখেছেন। আর ইমাম মালেককে জীবিত থাকতেই অত্যাধিক শান শওকতের জিন্দেগী দান করেছেন। তাঁর ইন্তিকালের পরে তার নাম কে সকল ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিক্বহ অন্বেষণকারীর মুখে অত্যন্ত সুনামের সাথে সরব রেখেছেন। পৃথিবীজুড়ে ইমাম মালেক (রহ.) এর নামকে চমকিয়ে দিয়েছেন। আর এর একমাত্র কারণ ছিল ইখলাস ও নেক নিয়ত। তাই কেউ যদি সফল হতে চায় ইখলাস ও নেক নিয়তের কোনো বিকল্প নেই। আমরা যদি আমাদের আশে পাশে লক্ষ্য করি তাহলে এমন হাজারো নজীর দেখতে পাবো যে ইখলাস ও নেক নিয়তের কারণে আল্লাহপাক তা উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন, আবার ইখলাস ও নেক নিয়ত না থাকার কারণে তা ব্যর্থতার ষোকলায় পূর্ণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মারকাযুল ফিকরিল ইসলমীর কথা। ১৯৯১ ইং ৫মে সোমবার ঢাকার জসিম উদ্দীন রোডে ভাড়া বাড়ীতে মুহিউসসুন্নাহ হারদূয়ী হযরতের দুই রাক'আত নামায ও দু'আ এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত (দা. বা.) যেই মারাকায প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (বিস্তারিত জানতে ফক্বীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত মা'মুলাতে মাসূরা দ্রষ্টব্য) মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে আল্লাহ পাক তার আকাশচুম্বী সফলতা দান করেছেন। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দ্বীনি বিদ্যাপীঠে রূপান্তরিত করেছেন। একই অবস্থা জামিআতুল আবরার বসুন্ধরা রিভারভিউ, সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স বাংলাদেশ ও মদীনাতুল উলূম বসুন্ধরা এর। এর কারণ কি? এর অন্যতম কারণ ইমাম মালেক (রহ.) এর উক্ত উক্তি। ইখলাস ও নেক নিয়ত। হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত (দা. বা.) এর নগণ্য খাদিম হিসেবে মনে হয় হযরত ওয়ালার শুধু ইখলাস ও নেক নিয়তই নয় বরং হযরতের শান শওকত ইলম, আমল, হাদীসের পাঠদান, ফতওয়ার ময়দান, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষনতা এমনকি রাসূলের মুহাব্বতে ইমাম মালেকের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। যুগের ইমাম মালেক। তা না হলে অসুস্থতা সত্ত্বেও, ডাক্তারদের কড়া নিষেধ, পরিবার পরিজনের আপত্তি বিশেষ করে গত ১৮ জুন ১২ মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হওয়ার সত্বেও ১২ আগস্ট ১২ বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও রাসূলের রওজায় যেতে পারে?

মাওলানা আব্দুর রহমান
মুফতী ও মুহাদ্দিস
রেল ষ্টেশন মাদরাসা, যশোর।

খবরাখবর

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত সাহেবের সহধর্মিণীর ইন্তিকাল ও দাফন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক :

গত ৪ঠা জিলক্বদ ১৪৩৩ হিজরী মোতাবেক ২১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ভোর ৪টায় হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দামাত বরকাতুহুমের প্রিয় সহধর্মিণী ইন্তিকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ধর্মীয় দিক থেকে তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। শরয়ী পর্দার ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা সর্বমহলে ছিল স্বীকৃত। সদকা খয়রাতের ক্ষেত্রে তাঁর হাত ছিল সুদূর প্রসারিত। আত্মীয় অনাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল ঈর্ষনীয়। ফলে তাঁর ইন্তিকালের পর শতশত নারী তাঁকে এক নজর দেখার জন্য পর্দাসহকারে দিকভ্রান্তের মত ছুটে আসে। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্টা ও তরবিয়াতের ফসল, তাঁর দুটো সন্তানই হাফেজে কুরআন, আলেমে দ্বীন, মুফতী ও দ্বীনের একনিষ্ট খাদেম। বড় ছেলে মুফতী আরশাদ রহমানী হযরত ওয়ালা হারদূয়ী (রহ.) এর সুযোগ্য খলীফা। দেশের বৃহত্তম দ্বীনি এদারা বগুড়া জামীল মাদরাসার প্রধান নির্বাহী, মরকযুল ফিকরিল ইসলামী বসুন্ধরার কার্যনির্বাহী, মাসিক আল-আবরারের প্রধান সম্পাদক, জামিয়াতুল আবরার বাংলাদেশ ঢাকা, জামিয়া মাদানিয়া চট্টগ্রামের সুযোগ্য শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাঁর ছোট ছেলে মুফতী শাহেদ রহমানী সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স বাংলাদেশের পরিচালক, জামিয়াতুল আবরার বাংলাদেশ ঢাকা, জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদির সিনিয়র মুহাদ্দেস ও মুফতী।

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দামাত বরকাতুহুমের দেশ ব্যাপী বহুবিদ দ্বীনি খিদমাতের পেছনে উল্লেখযোগ্য প্রেরণার উৎস এ মহীয়সী নারী। তাঁর বিশেষ আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রহমানিয়া মাদরাসা কমপ্লেক্স ইমামনগর। এটি এলাকার আদর্শ একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পাশে অবস্থিত মহল্লার কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

দাফন প্রক্রিয়া যেভাবে সম্পন্ন হয় :

যাদের উত্তম ও উৎকৃষ্ট আদর্শে উজ্জীবিত মুসলিম রমনীরা, তাদের অন্যতম অগ্রপথিক নবী পরিবারের পূতপবিত্র উম্মুহাতুল মুমিনীন ও মহানবীর কলিজার টুকরা মেয়েদের কাফেলা। উক্ত কাফেলার শীর্ষে হযরত ফাতেমা (রা.) তিনি তাঁর ইন্তিকাল পূর্ব সময়ে প্রিয় স্বামী হযরত আলী রা.কে বিশেষ কয়টি অসিয়ত করেছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১. আমার ইন্তিকালের খবর গাইরে মাহরামদের যেন জানানো না হয়। ২. ইন্তিকালের পরে আমার দাফন কার্য সম্পাদনে যেন বিলম্ব করা না হয়। কেননা আমার জীবদ্দশায় আমার পোশাকের আঁচলে কোনো গাইরে মাহরামের নজর কখনও পড়েনি মৃত্যুর পরেও আমার কাফনের উপর কোনো গাইরে মাহরামের নজর যেন না পড়ে।

ঠিক তেমনি এক দৃশ্য ১৪শবছর পরেও এই মহীয়সী নারীর ইন্তিকালে অবলোকন করা গেছে। তাঁর ইন্তিকালের কোনো প্রকার এলান করা হয়নি। বিলম্ব করা হয়নি জানাযা ও দাফনকার্য সম্পাদনে। এই মহিয়সী নারী তাঁর জীবদ্দশায় পর্দা পালনে যেভাবে কঠোর ছিলেন, ইন্তিকালের পর জানাযা ও দাফন কার্যও কঠোর পর্দাব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। লাশ রাখা হয় বাড়ীর আঙ্গিনায় যেখানে কোনো গাইরে মাহরাম পুরুষের যাতায়াতের সুযোগ ছিলনা। বাড়ীর আঙ্গিনা থেকে স্থায়ী নিবাস কবর পর্যন্ত আড়াল করা হয় মজবুত পর্দার বেষ্টনী দিয়ে। লাশ নিয়ে যাওয়া থেকে দাফন কার্য সম্পাদন পর্যন্ত ছিল সেই সোনালী যুগের এক অভূতপূর্ব ও অবিশ্বাষ্য দৃশ্য। যা পুরো মুসলিম সমাজের নর-নারীকে স্মরন করিয়ে দেয় মৃত্যুর আগে ও পরে পর্দার অনিবার্যতাকে। আল্লাহ তা'আলা মরহুমাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে সুউচ্চ মকাম দান করুন।

ঈসালে সওয়াব ও সমবেদনা জ্ঞাপন :

মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দসহ দেশ বিদেশের বহু স্থানে খতমে কুরআন ও খতমে তাহলীল পড়ে দু'আ করা হয়।

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দামাত বারাকাতুহুম ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা আবুল কাসেম নূমানী সাহেব, আওলাদে রাসূল সৈয়দ আরশাদ মাদানী, ভারত, সৈয়দ আব্দুল মজীদ নদীম, পাকিস্তান, শায়খুল ইসলাম আল্লামা তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমসহ দেশ বিদেশে বহু শীর্ষ উলামা মাশায়েখগণ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ :

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দামাত বারাকাতুহুম এক বিবৃতিতে মরহুমার ইন্তিকালে যারা যেভাবে দু'আ করেছেন, সমবেদনা প্রকাশ করেছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মারকাযের
খবরাখবর